সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের কবিতার সংগীত রূপান্তর

Vol. 22 | No. 2 | 1979

Check for updates

Volume	22
Issue	2
Year	1979
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সন্‌জীদা খাতুন
Published online	June 1, 1979
DOI	10.62328/sp.v22i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v22i2.4
Pages	134-157
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রবীন্দ্রনাথের কবিতার সংগীত রূপান্তর

সনজীদা খাতুন

শিল্পসাহিত্যের ভাব ও আঙ্গিকের অত্যাগসহন প্রকৃতির কথা বহুকীর্তিত। কিন্তু লক্ষ্য করলে বিস্মিত হ'তে হয় যে, কবিতার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি গানের ক্ষেত্রেও ব্যবহারিক-ভাবে এ-বচনকে মান দেননি রবীন্দ্রনাথ। কবিতাকে গানে রূপান্তরিত করবার সময় রবীন্দ্রনাথ তো কই শিল্পের ভাব ও আঙ্গিকের অবিচ্ছেদ্যতার তত্ত্বকে গ্রাহ্য করলেন না। এই রূপান্তর বাস্তবিক আধেয় বিষয়ে কি পরিবর্তন আনছে, তাতে উন্নতি বা অবনতি ঘটছে কিনা, অথবা তার ফল একই থাকছে কিম্বা সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে, এ-পরিবর্তনের প্রয়োজনই বা বোধ করা হচ্ছে কেন—এইসব বিষয়ের বিশ্লেষণ-মূলক বিচারের আবশ্যক রয়েছে।

কবিতাকে গান করতে গিয়ে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে এমন নিদর্শন নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা যাক। যেমন, "মহুয়া" কাব্যের 'প্রত্যাশা' কবিতাটির 'প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায়' গানে রূপান্তর। চারটি স্থলে অল্প পাঠভেদ হয়েছে, এক. দ্বিতীয় স্তবকের দ্বিতীয় পংক্তিতে 'কী উল্লাসে'র পরিবর্তে 'কী উচ্ছ্বাসে', দুই. তৃতীয় স্তবকের দ্বিতীয় পংক্তি 'কী বিশ্বাসে'র বদলে 'কী আশ্বাসে', তিন. ঐ স্তবকেরই পঞ্চম পংক্তির শেষে 'দীর্ঘশ্বাসে'র জায়গায় 'কী বিশ্বাসে', চার. চতুর্থ স্তবকে চতুর্থ পংক্তিতে 'নিমেষ-গণন হয় না কি মোর সারা' স্থলে 'নিমেষ-গণন হয় নি কি মোর সারা'।

"চলন্তিকা" অভিধানে[১] 'উচ্ছ্বাসে'র প্রতিশব্দ হিসেবে 'উল্লাস' শব্দ আছে, কিন্তু 'উল্লাস' অর্থে 'উচ্ছ্বাস' নেই। 'উল্লাস' 'অতিশয় আনন্দ' বা 'আহ্লাদ' বোঝায়, আর 'উচ্ছ্বাসে'র বহু অর্থের মধ্যে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি হচ্ছে 'ভাবের আবেগ', 'বিকাশ', 'স্ফুরণ', 'স্ফীতি'। ফাল্গুনের শিরীষ শাখায় যে-নাচের মাতন লাগে, তাকে 'উল্লাস' বললে 'শিরীষ ডালে'র ছবিই শুধু চোখে ভাসে। 'উচ্ছ্বাস' বলতে চোখে ভাসে পুষ্পিত শিরীষের শাখা, শিরীষের ডালে ভাবের আবেগের স্ফুরণ, ভাবের উচ্ছ্বাস।

এ ছাড়া ছন্দ সংগীতের দিক থেকে পংক্তিশেষের 'উন্মাদের' সঙ্গে 'উচ্ছ্বাসে'-র ধ্বনি সামঞ্জস্য 'উল্লাসে'-র চাইতে বেশী। ম-য়ের আগে ন এবং ছ-য়ের আগে চ ধ্বনি হস্-অন্ত হয়ে যে-বন্ধতা সৃষ্টি করতে পারে, ল-য়ের সঙ্গে ল ধ্বনি স্বভাব-তারল্যে তা পারে না। সংগীত ক্ষেত্রে ধ্বনিসামঞ্জস্য সৃজনে শিল্পী অধিকতর যত্নবান ব'লে 'উল্লাসে'র স্থলে 'উচ্ছ্বাসে' প্রয়োগ এসেছে, এমন হ'তে পারে।

দ্বিতীয় পরিবর্তন 'কী বিশ্বাসে' স্থলে 'কী আশ্বাসে' প্রয়োগের একটি কারণ এই হ'তে পারে যে, সেই স্তবকেই গীতরূপের তৃতীয় পাঠভেদ 'দীর্ঘশ্বাসে'-র স্থলে

১. সংশোধিত ও পরিবর্ধিত নবম সংস্করণ, ১৩৬৯

'কী বিশ্বাসে' বিন্যাস করা হয়েছে। তাই একই স্তবকে দুবার এক বাক্যাংশ ব্যবহারের বদলে পরবর্তী স্তবকের দ্বিতীয় পংক্তির সঙ্গে মিলিয়ে এখানে 'কী আশ্বাসে' আনা হয়েছে। গানের প্রথম দুই স্তবকের দ্বিতীয় পংক্তিতে 'কী উচ্ছ্বাসে' এবং শেষ দুই স্তবকের দ্বিতীয় পংক্তিতে 'কী আশ্বাসে' ব্যবহার ক'রে সম্ভবতঃ সারূপ্য বা ধ্বনিসাম্য বজায় রাখা হয়েছে। 'কী বিশ্বাসে'র সুরে 'দীর্ঘশ্বাসে' উচ্চারণ করতে গেলে স্বরধ্বনির উচ্চারণে অসুবিধা ঠেকে। এখানে 'দীর্ঘশ্বাসে' রাখতে চাইলে শিল্পী নিশ্চয়ই সুরের ধরন বদলে দিতেন। তবে প্রতি স্তবকশেষের প্রশ্নের আগে 'আমায় দেখি', 'শুনাও দেখি', 'কী বিশ্বাসে' এবং 'এলোমেলো' অংশগুলির প্রথম সিলেবলের যুক্ত ধ্বনিটির পর দ্বিতীয় সিলেবলের স্বরধ্বনিতে এক ছোট্ট 'তান' দিয়েছেন সুরকার। 'দীর্ঘশ্বাসে' বহাল থাকলে অন্য অংশগুলির মতো ক'রে সুরে স্বরধ্বনি খেলানো সম্ভব হত না।

শেষ যে ক্রিয়ার কালের পরিবর্তন, তার অর্থভেদগত তাৎপর্য প্রথমে লক্ষণীয়। কবিতায় বক্তব্য—'হায় গো আমার ভাগ্য-রাতের তারা, / নিমেষ-গণন হয় না কি মোর সারা'। অর্থাৎ, হে আমার ভাগ্যতারকা, তোমার লিখন কি এই যে, আমার নিমেষ-গণন শেষ হবার নয় কোনোদিন? প্রতীক্ষার এই কালগণনা কি শেষ হবে না? আর কতদিন ধ'রে চলবে এই প্রহরগণনা? এখানে প্রশ্ন ভাগ্যের গতি সম্পর্কে। গানের বাণীতে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে প্রশ্ন জানানো হল—'হায় গো আমার ভাগ্যরাতের তারা, নিমেষ-গণন হয় নি কি মোর সারা'। এখানে 'হয় নি কি' বস্তুতঃ প্রশ্ন করছে 'হয়েছে কি'? এতদিন তো অপেক্ষায় কেটেছে, এইবারে কি আমার প্রতীক্ষার শেষ হল? 'হয় না' পদে, কাল সুনির্দিষ্ট নয়। 'হয় নি' প্রশ্ন বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন। এইবারে, এখন বুঝি নিমেষ-গণনা শেষ হল—এমন একটা প্রত্যাশা গানের প্রশ্নে। 'হয় না' বলতে কালের নির্দিষ্ট বন্ধন নেই ব'লেই যেন একটা অধীরতার উচ্ছ্বাস ধ্বনিত হয়। অপরপক্ষে 'হয় নি কি' মিনতি বেদনাভরা নির্দিষ্ট প্রশ্ন। বৎসরে বৎসরে ফাল্গুনের প্রতি দিনে (প্রতি অহঃ) যে প্রশ্ন—'এসেছে কি', 'আসেনি কি', 'সে কি আসে' রূপে ঘুরে ঘুরে এসেছে—শেষের দিনে তার সুরে দেখি পূর্ণ প্রত্যাশা 'সে কি এল?'। এ-প্রত্যাশার সঙ্গে 'হয় না' কথাটির চির-হতাশ ভাবের চাইতে 'হয় নি কি' ব'লে বিশেষ প্রশ্ন অধিকতর সামঞ্জস্যময় মনে হয়।

সুরে প্রশ্নের তীব্রতা 'ই' ধ্বনিতে যেমন যথার্থ হয়ে বাজে 'আ' ধ্বনি সেই তীব্রতাকে তেমন একান্ত ক'রে ধরতে পারে না, সুর ছড়িয়ে যায়। 'হয় নি'-র পরে 'কি' উচ্চারণে 'ই' স্বরধ্বনির উচ্চারণ সহজে প্রবাহিত হয়ে যেতে পারে। 'হয়' বলতেই সুরে প্রশ্নের ভাব সঞ্চারিত হয়ে গেছে, যেমন :

'ণা	-র্জ্জা	র্জ্জা	|	র্জ্জা'
হ	য়	নি	|	কি

সুরে 'হয়' উচ্চারণের এই পর্যায়ে 'না' উচ্চারণ করবার জন্য 'আ' স্বরধ্বনি আনতে গেলে, উদ্দিষ্ট ভাব সংহতি হারাত। পরবর্তী 'কি'-র সঙ্গে স্বরসঙ্গতি রেখে 'হয় নি' ব্যবহার সাংগীতিক দিক থেকে সার্থক হয়েছে।

রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপি '127'-এ কবির আপন হস্তাক্ষরে এই পদের একটি পাঠ লেখা আছে। তাতে গানের পাঠের সঙ্গে 'উল্লাসে' এবং 'দীর্ঘশ্বাসে'র ভেদ নেই। 'ফুল্ল শিরীষ' স্থলে আছে 'শিরীষ আমায়'। 'সন্ধ্যাবেলা' স্থলে 'সন্ধেবেলা'। আর বিরাম চিহ্নের কিছু ভেদ রয়েছে। কবিতার চাইতে গানের পাঠের সঙ্গে এই পাণ্ডুলিপির মিল বেশী। এই

খসড়ার পরে কবিতাতে কিছু পরিবর্তন করলেও, সুর দেবার সময় প্রায় এই পাঠকেই সুরারোপের উপযুক্ত মনে করা হয়েছিল, এমন অনুমান করা যেতে পারে।

কবিতা রচনা আগে, গান পরে—এ বিষয়ে নিশ্চিত হবার কারণ আছে। ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসে "মহুয়া" কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। "গীতবিতান" প্রথম সংস্করণে ১৩৩৮ সালে প্রকাশিত "গীতোৎসব" গ্রন্থ পর্যন্ত মুদ্রিত রবীন্দ্ররচনা থেকে গান সংগৃহীত হয়েছে দেখি। সে-সংস্করণে 'প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায়' বা "মহুয়া" কাব্যের কোনো গানই অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ১৩৩৯ সালে প্রকাশিত "গীতবিতানে"র তৃতীয় খণ্ডে "মহুয়া"র 'বিরস দিন বিরল কাজ', 'চপল তব নবীন আঁখি দুটি', 'জানি তোমার অজানা নাহি গো' ও 'অনেক দিনের আমার যে গান' মুদ্রিত আছে, কিন্তু 'প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায়' এ-সময়েও গান হিসেবে সংকলিত হয়নি। ভাদ্র ১৩৪৬-এ মুদ্রিত এবং মাঘ ১৩৪৮-এ 'বহুল প্রচারিত' (বর্তমান "গীতবিতান" গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য) "গীতবিতান" দ্বিতীয় সংস্করণে আলোচ্য গানটি সন্নিবেশিত হয়েছে। "মহুয়া"র মোট এগারোখানি গানের মধ্যে ১৩৩৯-এ মুদ্রিত চারটি বাদ দিলে, অপর সাতখানি সম্পর্কে আলোচনা বাকী থাকে। শান্তিদেব ঘোষের "রবীন্দ্রসংগীত" গ্রন্থের (পুনর্মুদ্রণ ফাল্গুন ১৩৭৬) ১৭৩ সংখ্যক পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে ১৩৪০ সালের ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহে রবীন্দ্রনাথ "মহুয়া"র সাতখানি কবিতায় 'সুরযোজনা' করেন।

গান আগে কবিতা পরে—এমন দুটি রচনার কথা এখানে উল্লেখ করি। এক. 'আজি বরিষণ মুখরিত শ্রাবণরাতি'। ৩০ শ্রাবণ ১৩৪২ তারিখে শান্তিনিকেতনের 'সিংহসদনে' অনুষ্ঠিত 'বর্ষামঙ্গলে'-র অনুষ্ঠানপত্রে[২] এই গানটির একটু ভিন্ন রূপ পাই। এখানে "বীথিকা"র 'প্রতীক্ষা' কবিতার মতো 'বরষণ' নেই, অধুনা প্রচলিত গানের মতো 'বরিষণ' আছে। দ্বিতীয় পংক্তির পাঠ—'একা বসে সারা তিবেদনার মালা গাঁথি'। 'আঁধার ঘরেতে রাখি দুয়ার খুলি' লাইনটি এ-পাঠে 'আঁধার ঘরে রাখি দ্বার খুলি'। 'জানি জানি তুমি এসেছ, এ পথে'[৩] এবং 'মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ' গান দুটিও এই অনুষ্ঠানপত্রে ভিন্নরূপে পাওয়া যায়। অনুষ্ঠানপত্র থেকে এদুটি গান অখণ্ড "গীতবিতানে"র ১০৫ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে। কিন্তু, 'আজি বরিষণ মুখরিত' গানটির 'অনুষ্ঠানপত্রে' মুদ্রিত পাঠ "গীতবিতানে" স্থান পায়নি।

অনুষ্ঠানপত্রে প্রচারিত রূপটির সুর অপ্রকাশিত থাকায় এই পাঠভেদে সুরের প্রয়োজন কিভাবে সাধিত হয়েছে সে সম্পর্কে মন্তব্য করা যায় না। "বীথিকা" গ্রন্থের 'প্রতীক্ষা' কবিতায় আছে 'আজি বরষণ মুখরিত / শ্রাবণ রাতি'। গানে 'বরিষণ'তে 'রি' উচ্চারণের সময় সুর চ'ড়ে গেছে ব'লে 'রো' উচ্চারণের চাইতে ই-কারান্ত উচ্চারণ সুরকে সহজে বহন করেছে। ই বা উ ধ্বনি তীব্র সুর উচ্চারণে সহায়তা করে। আর দুটি মাত্র জায়গায় পাঠভেদ পাচ্ছি। আরম্ভের দিককার 'শ্রাবণরাতি', 'একেলা গাঁথি'র সঙ্গে মিল রেখে দুই অন্তরার শেষে ছন্দোসুষমার জন্য 'মরম সাথি' এবং 'রয়েছি পাতি' বিন্যাস করা হয়েছে কবিতায়। গানের সুরে 'মরম' এবং 'রয়েছি' অংশ পরিত্যক্ত হয়েছে। 'দুখরজনীর সাথি'-র মধ্যখানে 'মরম' কথাটি থাকা না-থাকায় অর্থে কোনো পার্থক্য ঘটে না। কেননা

---

২. 'রবীন্দ্রভবনে' সংরক্ষিত।

৩. "গীতবিতানে" এই গানটির দ্বিতীয় পংক্তিতে ছাপা হয়েছে 'এসো তুমি'। কিন্তু 'অনুষ্ঠানপত্রে' রয়েছে 'এসো তবে'। এ-ছাপাতে অনবধানতাজনিত প্রমাদ ঘটেছে মনে হয়। নগণ্য বানানের পরিবর্তন আছে। এছাড়া শেষ পংক্তিতে 'দোলে' স্থলে 'দুলে' করা হয়েছে সম্ভবতঃ পূর্ব অন্ত্যানুপ্রাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে।

দুখরজনীতে সাথী হয়ে যে কাছে আসে, সে 'মরমসাথি' বটে, তাই 'মরম' বর্জনে গানের পদ নির্বিকার। কিন্তু 'তবু বৃথা আশ্বাসে / মিলন-আসন খানি / রয়েছি পাতি' অংশে ক্রিয়াপদ বর্জিত হ'লে বাক্যের অর্থনিষ্পত্তি হয় না। সেজন্য 'তবু বৃথা আশ্বাসে'র পর গানে একটি নতুন চরণ যোগ ক'রে বলতে হয়েছে 'ধূলি-'পরে রাখিব রে মিলন-আসন খানি পাতি'। 'মরম' কথাটি ছেড়ে দিয়ে 'দুখরজনীর সাথি' অংশে সুরের লীলায়িত হবার সুযোগ হয়েছে। সাথীর আগমন চিন্তার আনন্দ সুরে খেলেছে :

'র্সা গা গা গা | গা -মা -পা পমা | গা -রা সা -রা | -না -র্সা'
দু খ র জ | নী ০ ০ র | সা ০ থি ০ | ০ ০

'ধূলি-'পরে রাখিব রে' অংশে বিবৃতির সুর দেবার জন্য সঞ্চারীর 'আসিছে সে ধারাজলে' এই বিবরণের সুরই ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় অন্তরাতে প্রথম অন্তরার সুর ব্যবহার-রীতি প্রচলিত। এখানে সঞ্চারীর সুরের এইরকম ব্যবহারে নতুনত্ব লক্ষ্য করি।

''বীথিকা'' গ্রন্থের 'বাদল সন্ধ্যা' কবিতার আদি রূপ 'জানি জানি এসেছ এ পথে মনের ভুলে' গানটির সুর অপ্রকাশিত।[৪] কাজেই এই গানের বহুল প্রচলিত রূপটির সঙ্গেই কবিতার ভেদ আলোচনা করছি। আলোচ্য গীতরূপে দুই অন্তরার শেষে 'না-হয় সহসা এসেছ এ পথে / মনের ভুলে' অংশের প্রয়োজন ছিল না। 'তাই হোক তবে তাই হোক, দ্বার দিলেম খুলে বাক্যেই 'না-হয় সহসা' ইত্যাদি বক্তব্য নিহিত আছে। একটি ব্যাপার গানের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করবার মত। গানে ধ্রুবপদ গাইবার রীতি রয়েছে ব'লে এবং সুর ফিরে ফিরে ভাবকে তুলে ধরে ব'লে বাক্যে একবার বলা কথা বাণীতে আরো বিশ্লেষণ ক'রে বোঝাবার একান্ত প্রয়োজন থাকে না। গানে বাক্‌সংযমের সুযোগ এইজন্য কবিতার তুলনায় অধিক ব'লে মনে হয়।

সুরের টানে মাত্রাপূরণের সুযোগ থাকে ব'লে, কবিতার প্রয়োজনীয় ছন্দ গানের পদে অব্যাহত রাখবার দরকার হয় না। ''পূরবী''র 'আনমনা' কবিতার গীতরূপান্তর শুরু হয়েছে 'আন্‌মনা, আন্‌মনা' পংক্তি দিয়ে। কবিতায় রয়েছে 'আনমনা গো, আনমনা,' কারণ সমস্ত কবিতাটির পূর্ণ পর্বগুলি চতুর্মাত্রিক। 'গো' বাদ দিলে কবিতায় ছন্দোপতন হত।

এই গানটির দ্বিতীয় পংক্তিতে আছে 'তোমার কাছে আমার বাণীর মাল্যখানি আনব না'। কিন্তু কবিতায় দেখি 'তোমার কাছে আমার বাণীর মালাখানি আনব না'। প্রথমটা 'মাল্যখানি' পাঠই কানে শুনতে ভালো লাগলেও, পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ক'রে দেখলে, কবিতাতে 'মালাখানি' এবং 'মাল্যখানি' উভয় পাঠই শেষ পর্যন্ত ভালো লাগে। 'বাণীর মালা' উচ্চারণে অন্তরঙ্গ কথা দিয়ে অনুরাগ ভরে গেঁথে তোলা মণিমালার ভাব জাগে। বাণী-রচিত পরম যত্নের মালা মনে হয়। 'মাল্য' ছন্দকে জমাট করে ঠিকই, তাছাড়া 'মালাকে' গুরুত্ব দিয়ে 'মাল্য' বলা হচ্ছে ভাবতেও বাধা নেই। কিন্তু গানে 'মালাখানি' একেবারে বলিষ্ঠতা হারায়। গীতরূপের ত্রিমাত্রিক ছন্দে 'মাল্যখানি' উপযুক্ত রকম জোর পায়।

আনমনা চিত্তের কাছে বাণীর মালায় গেঁথে কোনো বার্তা পৌঁছানোর চেষ্টা করলে ব্যর্থ হতে হয়। কিন্তু, ছন্দে গাঁথা বাণী যদি মন্দ মৃদুল তানে নিভৃত চিত্তের প্রাঙ্গণ-প্রান্তে আলপনার মত এঁকে চলা যায়, তবে বুঝি তার আবেদন কোনোখানে কিছু

৪. এই প্রবন্ধ রচনার সময় ১৯৭৬ সালের জুন মাস। পরবর্তী সময়ে শান্তিদেব ঘোষ এই গানটি রেকর্ডে গেয়েছেন।

সার্থকতা পায়। এই বোধের থেকে, একটানা সুর গেঁথে চলবার কথা ঘোষণা করতে গিয়ে বিমনা চিত্তের একাধিক পটভূমি চিত্রণ করেছেন কবি কবিতায়।

জনশূন্য তটের পানে ফিরবে হাঁসের দল ;
স্বচ্ছ নদীর জল
আকাশ পানে রইবে পেতে কান,
বুকের তলে শুনবে বলে গ্রহতারার গান ;
কুলায় ফেরা পাখি
নীল আকাশের বিরামখানি রাখবে ডানায় ঢাকি ;
বেণুশাখার অন্তরালে অস্তপারের রবি
আঁকিবে মেঘে মুছবে আবার শেষ বিদায়ের ছবি ;
স্তব্ধ হবে দিনের বেলার ক্ষুব্ধ হাওয়ার দোলা
তখন তোমার মন যদি রয় খোলা ;—
তখন সন্ধ্যাতারা
পায় যদি তার সাড়া
তোমার উদার আঁখিতারার পারে ;
কনকচাঁপার গন্ধ-ছোঁওয়া বনের অন্ধকারে
ক্লান্তি-অলস ভাবনা যদি ফুল বিছানো ভূঁয়ে
মেলিয়ে ছায়া এলিয়ে থাকে শুয়ে ;

—'ছন্দে গাঁথা বাণী' শুনাবার সময় হবে তখন।

গানে এই দীর্ঘ বিবরণ পরিত্যক্ত। বলা যেত, সুরের সঞ্চরণের জন্য অবকাশ সৃষ্টির প্রয়োজনে কথাকে ছেঁটেছেন শিল্পী। কিন্তু ছাঁটা (trimming) যাকে বলে—দেহটিকে মোটামুটি বজায় রেখে এখানে ওখানে দরকার মতো কাঁচি চালানো—তা করা হয়নি এক্ষেত্রে। আগা এবং গোড়াটুকু বজায় রেখে কাণ্ড অংশ সম্পূর্ণ কেটে ফেলা হয়েছে। তাতেও বলা যেত যে, গানের স্বভাব-সুলভ সংক্ষিপ্তির কথা মনে ক'রে এই মধ্যবর্জন। তা-ও বলতে পারি না, কারণ, অনেক দীর্ঘগানই তাঁর রচনাতে রয়েছে। এমন নিদর্শনও রবীন্দ্ররচনায় আছে যে, গান রচনা করবার পর পদটিকে বাণীতে আরো ভরাট ক'রে কাব্যগ্রন্থে সংকলন করা হল[৫], পরে একসময়ে পরবর্তী পদটিতে আবার সুর দেওয়া হল। পুরো কবিতাকে কেন সুরে বলা যাবে না মনে হলে, একসঙ্গে অমন বড় বড় কবিতাকে কিছুমাত্র পরিবর্তন না ক'রে, অথবা প্রয়োজনীয় সামান্য পরিবর্তন ক'রে সুরে বেঁধেছেন কবি। তবে, এই গানটিকে 'শাপমোচন' নাটকের নায়কের মুখে বসাবার জন্য নাট্যকাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অংশেই শুধু সুর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।[৬] একই কারণে এই নাটকের প্রয়োজনেই 'তুমি কি কেবল ছবি' কবিতার তত্ত্বঅংশ বর্জন ক'রে কবিতার প্রথম দিক এবং শেষ চার পংক্তি ছাড়া শেষাংশে ধ্বনিমাধুর্যগত আবশ্যিক পরিবর্তন ক'রে নিয়ে সুর বসিয়েছিলেন।

শিল্পীমনের খেয়ালের নিয়ম নির্দেশ করা কঠিন। কখনো যদি দেখি কবিতাকে একটুও বদল না ক'রে গান ক'রে তোলা হল, পরেই দেখব সেই কবিতাকেই এদিক

৫. 'আরো একটু বসো তুমি' এবং 'আমার নয়ন তোমার নয়নতলে' গান দুটির কবিতা রূপান্তর 'আরো কিছুখন না হয় বসিয়ো পাশে' এবং 'আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়' "মহুয়া" কাব্যে যথাক্রমে 'গুপ্তধন' ও 'সন্ধান' নামে বিন্যস্ত হয়।
৬. দ্রষ্টব্য, শান্তিদেব ঘোষ : 'রবীন্দ্রসংগীত' পৃ. ১৭৩

ওদিক কেটে ছেঁটে নিয়ে আবার নতুন গানের রূপ খাড়া করা হয়েছে। আবার এমনও আছে যে, গান রচনার পর সেখানিকে আবার কবিতা হিসেবে শিল্প সম্পূর্ণতা দেওয়া হল, পরে সেই কবিতাকে আবার সুরে বলবার প্রেরণা এসেছে একসময়। আরো এমন দেখতে পাচ্ছি যে, কাটাকুটি করতে করতে একটি গান তৈরি হয়ে গেল—তবু লেখনী-লীলা ক্ষান্ত হোল না—চলতে চলতে পরে পরে রচনা হোল একাধিক কবিতা। আবার, দেহের ব্যাকুল ছন্দের কথা বলতে বলতে নারীর পূজার জন্যে যে-গান লেখা হোল, তা-ই পরে প্রেমের সর্বসমর্পণের বাণীতে মুখর হয়ে উঠল। একই কবিতার দু অংশ থেকে দুই গান জন্ম নিল, এমন ঘটনাও রয়েছে।

১৩৪২ সালের ২৮ শ্রাবণ তারিখে লেখা 'বাদলরাত্রি' (''বীথিকা'') কবিতার নীচে 'গান'-পরিচয় মুদ্রিত আছে। তাতে মনে হয় গান হিসেবেই এর রচনা। আলোচ্য 'কী বেদনা মোর জানো সে কি তুমি জানো' গানটি 'বর্ষামঙ্গল' শিরোনামে 'গান'-পরিচয় সমেত ১৩৪২-এর ভাদ্র সংখ্যা 'বিচিত্রা'তে প্রকাশিত হয়েছিল। তারকাচিহ্ন দিয়ে পাদটীকায় লেখা ছিল '৩০শে শ্রাবণ (১৩৪২) শান্তিনিকেতনে, বর্ষামঙ্গল উপলক্ষে রচিত ও গীত' (পৃ. ১৩৮)। কিন্তু রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ১৩৪২-এর 'বর্ষামঙ্গলে'র অনুষ্ঠান-পত্রে 'কী বেদনা মোর জানো সে কি তুমি জানো' নয়, তার রূপান্তর 'আমার কী বেদনা সে কি জান' গানের পাঠ মুদ্রিত দেখি।

'কী বেদনা মোর জানো সে কি তুমি জানো' গানটির স্বরলিপি ১৩৪২-এর অগ্রহায়ণে 'প্রবাসী' পত্রে প্রথম ছাপা হয়। গানের শুরুতে আর্ত সুর ধ্বনিত হয়েছে তারার 'র্সা', 'র্গা' ও কোমল 'র্রে'-তে সুরের সঞ্চরণে। 'কী বেদনা' প্রশ্নটি শেষ পর্যন্ত তারার 'সা' থেকে কোমল মধ্যমে ভেঙে পড়াতে প্রশ্নের অন্তরে বেদনার রণন শোনা গেছে। তারপরের 'মোর' কথাটি বলবার জন্য সুরকে নামিয়ে আনবার প্রয়োজনও ছিল। 'মোর' বলা না-থাকলেও বস্তুত: সুরে নিজের সঙ্গেও বেদনার সম্পর্ক জানানো হয়ে গিয়েছিল মধ্যমে নেমে আসায়। কথায় 'মোর' পদটি এখানে অপ্রয়োজনীয় ব'লে, সুরে বক্তব্য নির্দেশিত হয়ে যাবার পরেও এ-পদ বিন্যাস করা হচ্ছে। সুর যে কথার পাশাপাশি আপন চলার মধ্যে আপনার মতো ক'রে ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলে অগ্রসর হয়, তারই দৃষ্টান্ত এটি। গানে সুর উদ্দিষ্ট মূল ভাবটিকে আভাসিত করবার দায় গ্রহণ ক'রে আপন মতে লক্ষ্য পথে চলতে থাকে। সে-পথে কথার সঙ্গে মিলন যতদূর সাধ্য বজায় থাকে, তবে, যে-কথার যে-ভাব, তার সন্নিহিত সুরেই সে-ভাব সবসময় মূর্ত হয় না। এমন কোনো বাঁধা নিয়ম এই সমন্বয়ের শিল্পের বাস্তব ক্ষেত্রে খাটে না। তেমন নিয়ম থাকলে গানের দুই অন্তরার সুরে সচরাচর যে-মিল দেখা যায়—তা একান্ত অবিহিত হত, কেননা, দুই অন্তরায় একই কথা থাকে না। অনেক গানে সুর ভাবকে সযত্নে বহন ক'রে সুরের ভাবে মনকে আবিষ্ট ক'রে কথার প্রতি অমনোযোগী ক'রে তুলতে পারে। কথার সংবেদন সম্পর্কে অসচেতন অথচ সুরের যাদুকর গুণী শিল্পীর কণ্ঠে গানের ভাব সার্থক হওয়া অসম্ভব নয়। আপন অভিজ্ঞতাতে আমরা দেখেছি, বিভোর-হয়ে-গেয়ে-চলা গানের সুরেই মন ভ'রে থেকেছে, বহুদিন পর অকস্মাৎ একদিন হয়তো গানের বাণীর দিকে খেয়াল পড়ল, নতুন আবিষ্কার ঘটল তখন। তবে, এ-রকম ঘটনা সুরপ্রধান গানের ক্ষেত্রেই ঘটে বেশী। বাণীপ্রধান গানে সুর আপনাকে সংবৃত রাখে ব'লে বাণীই মনকে বিশেষ অধিকার করে। সুরের দিকে বা বাণীর দিকে অথবা ছন্দের দিকে একান্ত লক্ষ্য পড়বার মূলে আবার শ্রোতার ব্যক্তিগত রুচির প্রভাবও থাকে অনেকখানি।

'কী বেদনা মোর সে কি তুমি জানো' গানটিকে বাণীপ্রধান গানই বলব। তবু আবেগ প্রকাশের ব্যাকুলতায় 'ওগো মিতা—মোর অনেক দূরের মিতা—ওগো মিতা' বাণী

গানে অস্থির হয়ে ফেলাফিরি করেছে। তারার সুরে প্রশ্ন বেজে উঠবার পর বারবার 'মিতা' কথাটি বেজে উঠেছে মুদারার মধ্যমকে কেন্দ্র ক'রে শুদ্ধ গান্ধার এবং পঞ্চমকে প্রয়োজন মতো কাজে লাগিয়ে।

আর এই আবেগ ফুরাতে চায় না বলেই বুঝি কথার পরিমাণ কমিয়ে 'আমার কী বেদনা সে কি জানো' গানটি তৈরি হয়েছে।[৭] গানের আরম্ভে 'কী বেদনা সে কি জানো—ওগো মিতা —সুদূরের মিতা—ওগো মিতা, আমার কী বেদনা সে কি জান—ওগো মিতা সুদূরের মিতা—ওগো মিতা, আমার কী বেদনা—সে কি জানো—ওগো মিতা সুদূরের মিতা—ওগো মিতা' এতবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে হল। এইখানে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সেই কথা—'হায়' কথাটি উচ্চারণ হলেই ফুরিয়ে যায়, সুর তার মর্ম উদ্‌ঘাটন করেই চলে নানাভাবে, তার প্রাণের মধ্যেকার সবটুকু কথা বার করতে থাকে টেনে টেনে ('সংগীত-চিন্তা' পৃ. ২৩-২৪)। এক্ষেত্রে যেন অভীষ্ট ভাবটি একবার একটি গানে প্রকাশ ক'রে মন তৃপ্তি মানে নি। তাই আবার অন্য সুরে ফিরে ফিরে বলে তৃপ্তি লাভের চেষ্টা।

লক্ষ্য করলে আশ্চর্য হতে হয় যে, কথাপ্রধান আগের রূপটির স্বরলিপি যেখানে তিন পৃষ্ঠা জায়গা নিয়েছিল—কথা-খসানো এই গানটি সেখানে জায়গা নিল পাঁচ পৃষ্ঠা। সাদা কথায়, আলোচ্য গানের দ্বিতীয় রূপে সুরের স্থান হল বড়। কারণ এখানে সুর কথার আবেগকে নানাভাবে ছাড়া দেবার সাধনায় নিরত রয়েছে। কীর্তনে 'কথার তান'[৮] যে-কাজ করে, এ-গানের অল্প কথার সঙ্গে বিচিত্র সুরের তান সেই কাজটি সাধন করেছে।

পরবর্তী গানটির সুরে কীর্তনের ঢঙ পাওয়া যায়। **'ধা -নর্সা। -ধনা। ধপা/ধপা'**, বা **'ধনা -র্সনা -ধনা। ধপা/ধপা'**, **'মা -পদা -মপা। মগা'**, বা, **'মপা -দপা -মপা। মগা'**, **'ধনা র্সনা। ধপা/ধপা'**, **'র্সা। -র্রা। -র্সনা'** ইত্যাদি স্বরবিন্যাসের জন্য কীর্তনে ধাঁচ এসেছে।

প্রথম রূপটি থেকে দ্বিতীয় রূপটিতে আসতে কবিতা নয়, গানকেই প্রধান করা হয়েছে বোঝা যায়, গানের পদের ছন্দের প্রতি খেয়াল করলে। প্রথম পদটি, কবিতা হিসেবে ষড়মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে নিবদ্ধ। কিন্তু দ্বিতীয় পদটির ছন্দ অনিবদ্ধ। ফলে, গানের অনুসরণেই এই পদের গঠন—তা ধরতে পারা যায়।

শিল্পীর আবেগ প্রথম রূপটিতেই নিঃশেষ হয়নি বলেই যেন দ্বিতীয় গানটিতে শিল্পের নবজন্ম ঘটল।

'আরো একটু বসো তুমি' গানটি "স্বরবিতান" তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৪৫-এ। এ-গানটিকে কবি পাণ্ডুলিপিতে একাধিকবার কাটাকুটি করেছেন। পাণ্ডুলিপি নং '28', '127' এবং '8'-এ তিনটি পাঠ পাওয়া যাচ্ছে। রবীন্দ্রচর্চা প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ শ্রীকানাই সামন্ত নানাভাবে বিচার ক'রে এই তিন পাণ্ডুলিপির যে-রচনাকাল অনুমান করেছেন,

---

৭. 'কী বেদনা' গানটিতে দুবার দুটো সুর দেওয়া হয়। শেষের দেওয়া কীর্তনের সুরটাই কায়েম রইল।' সুধীরচন্দ্র কর : 'কবি-কথা' পৃ. ১৭০

৮. 'কীর্তনের প্রাণ অর্থাৎ আঁখর কী বস্তু সেটা একটু ভেবে দেখা যায়। সেটা শুধু কথার তান নয় কি?...এই আঁখর, অর্থাৎ বাক্যের তান, অগ্নিচক্র থেকে স্ফুলিঙ্গের মতো কাব্যের নির্দিষ্ট পরিধি অতিক্রম করে বর্ষিত হতে থাকে।' "সংগীত-চিন্তা", পৃ. ৯৪

তাতে '28' নং পাণ্ডুলিপির কাল ধরা হয়েছে চৈত্র, ১৩৩২ থেকে অনুমান ফাল্গুন, ১৩৩৮। পাণ্ডুলিপি '127'-এর আনুমানিক কাল ২৩ শ্রাবণ থেকে আশ্বিন (?), ১৩৩৫। '28' সংখ্যক পাণ্ডুলিপির পাঠের কিয়দংশ এখানে তুলে দিচ্ছি।

আরো একটু বসো তুমি, আরো একটু কথা বলো
পথিক কেন অথির হেন নয়ন করে ছলছল।
যে দেখা মোর দেখতে এলে
তার কি কিছু আভাস পেলে,
এই যে গোপন সরোবরের রক্তকমল টলমল।

এই পাণ্ডুলিপির রেখালাঞ্ছিত পাঠের মধ্য থেকে বাকী পাঠ উদ্ধার করা দুরূহ। পাণ্ডুলিপি '127'-এর পাঠ এই :

আরো একটু বসো তুমি,
আরো একটু কথা বলো।
হে চঞ্চল পান্থ কেন, নয়ন হেন ছলছল।
যে দেখা মোর দেখতে এলে,
তার কি কিছু আভাস পেলে,
এই যে গোপন সরোবরের
রক্তকমল টলমল ?
মোর আঙিনায় অলস বীণায়
সময় নিয়ে করলে খেলা,
হায় অতিথি জানিনা তো
কী নিয়ে যাও যাবার বেলা ?
যে কথা মোর শুনতে এলে
তার কি কিছু আভাস পেলে ?
আমার বাণী রক্ততারার
মৌন আগুন জ্বলজ্বল ?

এই ছন্দান্তরিত পাঠটিও আগাগোড়া কেটে দেওয়া। নীচে একটি তারিখ পাওয়া যাচ্ছে '২৫ শ্রাবণ'। রচনা ১৩৩৫-এর পরে নয়, কারণ, ১৩৩৩ থেকে ১৩৩৫-এ লেখা '8' সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে নানা আঁকিবুকি কেটে ছবি এঁকে শেষ পর্যন্ত বর্তমানে প্রচলিত গানের রূপটি খাড়া করা হয়েছে।

এই গীতরূপ থেকে রূপান্তরিত "মহুয়া"তে মুদ্রিত কবিতায় তারিখ দেওয়া আছে ১৪ কার্তিক, ১৩৩৫। কবিতার আয়তনের তুলনায় 'আরো একটু বসো তুমি' গানের আয়তন চোখে পড়বার মত ছোট। কিন্তু আশ্চর্য এই যে দীর্ঘ কবিতাটির সার কথা ছাড়াও এ-গানে সে-রচনার অতিরিক্ত আর একটু সংবাদ রয়েছে—'যখন থাক দূরে / আমার মনের গোপন বাণী বাজে গভীর সুরে /। কাছে এলে তোমার আঁখি সকল কথা দেয় যে ঢাকি—/ সে যে মৌন প্রাণের রাতে তারা জ্বলোজ্বলো /।' মনের গোপন বাণীর কথা কবিতাতেও আছে—'সে মোর অগম অন্তর পারাবারে / রক্তকমল তরঙ্গে টলোমলো ।।' কিন্তু সে-বাণী বাঞ্ছিত জন দূরে থাকলে গভীর সুরে বাজে এবং কাছে এলে মৌন রাতের তারার মতো নীরবে দীপ্ত হয় শুধু, এ-কথা কবিতাতে নেই।

'আরো একটু বসো' পদে কবিতার ছন্দ বজায় আছে। রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের পাঠেই কবিতার ছন্দ নিখুঁত থাকে। তবে গানে ওই ছন্দ বাঁচিয়ে চলার আবশ্যক নেই। আবার গানের জন্য রচিত পদকে ছন্নছাড়া হতে হবে, এমনও কোনো কথা নেই।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১-এর 'বিচিত্রা'য় সম্পূর্ণ 'গুপ্তধন' কবিতাটির সুরে বাঁধা স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে। একবার গান রচনা—তারপরে তা থেকে কবিতা তৈরি—আবার কবিতাটিকে গান করা। এর কারণ কি পূর্বতন গীতরূপে অপরিতোষ? নাকি কবিতাকে সুরে পাঠ করবার ঝোঁকে এটিকে সুরে সাজানো?[৯] নিছক সৃষ্টি লীলা?[১০]

'আরো একটু বসো তুমি' গানটিতে সুরের খেলা বেশী। আটটি পংক্তিকে সুরে লিখতে সোয়া দুই পৃষ্ঠা আন্দাজ স্থান দরকার হয়েছে, আর কুড়ি লাইনের 'আরো কিছুখনে'র সুর লেখা রয়েছে চার পৃষ্ঠাতে। পদের দৈর্ঘ্যের তুলনায় স্বরলিপির দৈর্ঘ্য আলোচনা ক'রে দুই গানে সুরের খেলার পার্থক্য ধরতে পারা যায়। প্রথম গানে মীড়ের ব্যবহারও বেশী। আর আছে বিকৃত স্বর। রে গা ধা নি এই চার স্বরের কোমল রূপের বহুল প্রয়োগ এবং পরস্পর দূরবর্তী দুই স্বরের পাশাপাশি বিন্যাসে এ-গানে হৃদয়াবেগের প্রবলতা প্রকাশ পেয়েছে। যে-কথা শোনা হয়নি—যে-কথা জানানোও হল না—তার করুণা বেজেছে সুরে।

অন্যদিকে 'আরো কিছুখন' গানটিতে সুরের ওঠাপড়া কম, পাশাপাশি বা কাছাকাছি সুরে মৃদুচরণে চলাফেরা। রবীন্দ্রনাথের বাণীপ্রধান গানের ধারার মতো সংযত পদচারণ। গানের কথাটুকুকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য, স্বচ্ছন্দগতি করবার জন্য ঈষৎ সুরের নিষেক শুধু। রবীন্দ্রনাথ "সংগীত-চিন্তা"য় যেমন একবার বলেছিলেন—গান হচ্ছে 'সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ' (পৃ. ৪)। এক আধ জায়গায় মুদারার রেখাব থেকে তারার 'সা'-র মতো দূরের স্বরে মীড়ের সঙ্গে সুরের উর্ধ্বগমন আছে, যেমন:

'মা মগা | রগা গর্রা -া | -া -া র্সা'
অ লো০ | জ্ব০ লো ০ | ০ ০ ০

তা-ও, পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন 'ইসারা কি তার পেলে হে পথিক' উচ্চারণের জন্য সুরের উন্নতি প্রয়োজন থাকায়, মীড়ের অবিচ্ছেদে প্রবাহিত-হওয়া প্রচ্ছন্ন গতিতে উঁচু সুরে পৌঁছানো হয়েছে এখানে। 'গুপ্তধন' কবিতার সুরে একটি মাত্র বিকৃত স্বর ব্যবহার হয়েছে, কোমল নিখাদ। আগের গানটির চেয়ে এ-গানে সুরের তরঙ্গ অপেক্ষাকৃত কম।

উভয় গানে ত্রিমাত্রিক ছন্দ ব্যবহার সত্ত্বেও সুরের বৈশিষ্ট্যে প্রথম গানটি কিছু ধীর গতি। দৈর্ঘ্যের কারণে দ্বিতীয়টির চলার গতি বৃদ্ধি সঙ্গত হয়েছে। দুটি গানের মধ্যে প্রথমটি সুরপ্রধান, দ্বিতীয়টি বাণীপ্রধান—দুটি দু'জাতীয় সৃষ্টি। অর্থাৎ দুই রচনার পিছনে দুই ধরনের প্রেরণা কাজ করেছে। প্রথমটি, গান হিসেবেই রচনা; দ্বিতীয়টি, কবিতাতে সুর খুঁজে পাওয়া। দুই পদের রচনায় মূলগত যোগ থাকলেও, শিল্প হিসেবে উভয়ে স্বতন্ত্র।

৯. '১৩৪০ সালে ফাল্গুন মাসে বড়ো কবিতায় সুর দেবার বিশেষ ঝোঁক তাঁর মনে দেখা দিয়েছিল। এই মাসের শেষ সপ্তাহে একটানা 'মহুয়া'র সাতটি কবিতায় সুরযোজনা করেন'। শান্তিদেব ঘোষ: 'রবীন্দ্রসংগীত' পৃ. ১৭৩।

১০. 'গান জিনিসটা নিছক সৃষ্টিলীলা'। "সংগীত-চিন্তা", পৃ. ২০১

১৩৩৪-এর 'বার্ষিক বসুমতী' শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত "পরিত্রাণ" নাটকে রবীন্দ্রনাথ 'আমার নয়ন তোমার নয়নতলে' গানটি ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে "মহুয়া" কাব্যে এর কবিতা-পাঠান্তর 'আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়' মুদ্রিত হয়। রচনা কাল লেখা আছে 'শ্রাবণ ১৩৩৫?'।

ষোলো পংক্তিবিশিষ্ট এই কবিতাটির পূর্ববর্তী সংগীত রূপে আটটি পংক্তি রয়েছে। দুই পাঠে বক্তব্য একই। কবিতার ছন্দে ও গানের পদের ছন্দে ভেদ আছে। কবিতায় মাত্রাবৃত্ত ব্যবহার, গানের পদে স্বরবৃত্ত। পাঠ করতে গেলে কবিতারূপেই ভাবের সৌন্দর্য মনকে বেশী স্পর্শ করে। পূর্বপাঠের ভাষা ছন্দের অনুকূল ভাবে সহজ। যেমন—'সেথায় / কালো ছায়ার মায়ার ঘোরে পথ হারালো ও যে'। কবিতায় এ-অংশ 'সেথায় কখন্ অগম গোপন গহন মায়ায় / পথ হারাইল ও-যে'। পূর্বতন রচনা, গানের পদে বক্তব্যটুকু সংক্ষেপে ধরা রয়েছে।

স্বরবৃত্তের হালকা চতুর্মাত্রিক চালে কাব্যাংশ পড়তে গেলে অতিসহজতার ভাব মনে আসলেও, গানের ছন্দ এবং সুর বক্তব্যকে ভাবগম্ভীর করেছে। 'আরো একটু বসো তুমি'র মতো এ-গানটিতেও প্রায়শ: পরস্পর দূরবর্তী দুই স্বরকে পাশাপাশি বিন্যাস করা হয়েছে, বিশেষতঃ আরম্ভের দিকে। যেমন, 'নয়ন' বলতে সুর তানযুক্ত হয়ে কোমল নিখাদের স্পর্শযুক্ত ধৈবত হয়ে গড়িয়ে নামল রেখাবে—

'রা । -পা | পমপা -ধণা ণা | -ণধা -া রা'
ন ০ ০ | য় ০ ০০ ০ | ০ ০ ন্

একসুরে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে-থাকা ভাবের অভিব্যক্তিতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। একবার 'মনের কথা' ব'লে সাত মাত্রা একসুরে স্থির হয়ে থেকে দ্বিতীয়বার 'মনের কথা খোঁজে' বলাতে সন্ধানের বিষয় সম্পর্কে গুরুত্বের বোধ জন্মায়। কালো ছায়া ঘনিয়ে তুলবার জন্য 'সা' থেকে শুরু করে 'মা'-তে গিয়ে 'কালো ছায়ার' বলবার সময় শেষের হসন্তধ্বনির আগে সাতমাত্রা একভাবে দাঁড়িয়ে থাকা হয়েছে। 'পায় না সাড়া', 'রয় সে চেয়ে', 'আভাখানি', 'পেয়েছ কি মনে,' 'মালা আনি', 'কেউ শোনে', 'ব্যথা,' 'বিষাদ ছায়া' —এতগুলো জায়গাতে সুর টেনে রাখার নিদর্শন রয়েছে। শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ভাবের অভিব্যক্তির জন্যই একস্বরে একান্ত নিবেশ, সামগ্রিক ভাবের টানে সম্পূর্ণ গানের ছন্দের পদক্ষেপ দীর্ঘায়ত করবারও প্রয়োজন ছিল। প্রধানতঃ শুদ্ধ স্বরেই গানটির বিন্যাস, তবে বেশ কয়েকবার কোমল নিখাদ ও কড়ি মধ্যমের ব্যবহার আছে। ভাষাকে সহজ করে চলিত ভাষার ছন্দে পদ বেঁধে সুর এবং তার গতিতে ভাবকে গভীর এবং ঐশ্বর্যপূর্ণ করবার উদাহরণ এই গানটি।

কিন্তু কথার ভাব ও সুরের বিবেচনা থেকে যে-কথা বলা যায়, এ-গানের প্রথম সন্নিবেশের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে সে-কথা বলতে দ্বিধা হবে। "পরিত্রাণ" নাটকের লঘুচিত্ত রাজা 'রামচন্দ্র' নটীদেরকে গান ধরতে বলায় 'নটীদের নাচ ও গান' শিরোনামে এ-গানটির বিন্যাস। রবীন্দ্রনাথের নটীদের গানের বাণী ও ছন্দ কতদূর নটীদের যোগ্য সে-বিষয়েও প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। এই নাটকের পূর্বতন রূপ "প্রায়শ্চিত্তে" 'রামচন্দ্রে'র 'একটি জলদ তাল লাগাও' উক্তির পর এই জায়গায় নটীরা গেয়েছিল 'ও যে মানে না মানা'। অধুনা প্রচলিত গায়নভঙ্গিতে এ-গানে যে ভাবগম্ভীর মিনতি—তার সঙ্গে নাটকের সংলাপের নির্দেশের কোনো সঙ্গতি পাওয়া কঠিন। তবে পুরানো আমলে নটীদের গানের ধরন আলাদা ছিল, একথাও মনে রাখতে হবে।

বিশেষ অবস্থানের দিকে লক্ষ্য রেখেই কেবল কোনো গানকে বিচার করতে হবে, একথার জোরালো যুক্তি নেই। স্বতন্ত্রভাবে সে-গান যে-ভাব বহন করে, তার মূল্যেই গানের মর্মগ্রহণ করা অধিকতর সঙ্গত। নাটকের গান হিসেবে অবিচ্ছেদ্য রচনা হ'লে অবশ্য সে রকম গানের স্বতন্ত্র মূল্যায়ন কঠিন হবে।

'সন্ধান' কবিতাটিকে অবিকল এক রেখে সুর দিয়ে ছাপান হয়েছে 'বিচিত্রা' পত্রিকার ১৩৪১ সালের মাঘ সংখ্যায়। 'আমার নয়ন তব নয়নের' গানটিতে একটি শান্ত বিভোরতা আস্বাদন করা যায়। অথচ এই আত্মমগ্ন ভাবের সুরেও আবেগের প্রকাশ অবিরল। রবীন্দ্ররচিত শ্রেষ্ঠ কাব্যগীতির অন্যতম নিদর্শন এই গানটি। কথায় সুরে ছন্দে এই সমন্বয় স্বপ্নসম্ভব ব'লে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথে 'মনের কথার কুসুম কোরক' কেবল সন্ধানের বিষয়। পাওয়া নেই, পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটুকুই আনন্দের। বেদনার্ত সন্ধান নয়, আনন্দময় সন্ধান। তাই যাবতীয় 'আতুর'তা এবং 'অবুঝ' ভাবসঞ্জাত 'অশ্রুধারা'-পতনে নয়ন কেমন 'মজে' থাকে, তার মগ্ন মুগ্ধতা গলে পড়েছে সুরে। 'মজে' উচ্চারণকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখলে সে রস সম্পূর্ণ জানা যাবে না। সুরপ্রবাহে এই মগ্নতা প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে পূর্বাপর। 'অশ্রুধারায় মজে' বলতে সে-ভাব যেন বিগলিত হয়ে বয়ে গেল :

'পা -র্সা ণা | ধা পা -ধা | গা মা -জ্ঞা'
অ শ্‌ শ্রু | ধা রা য়্‌ | ম জে ০

ফুলের ভিতরে মধু যেমন ক'রে পুরে ওঠে[১১] —'মজে' কথাটি যেন তেমনি রসে ভ'রে উঠল একান্ত কাছাকাছি সুরে মীড়ে সঞ্চরণ করে। রসে পূর্ণ হবার জন্য গান্ধার থেকে মধ্যমে উঠে কোমল গান্ধারে ঘুরে এসে সে-রসকে নিটোল ক'রে তোলা হল।

"মহুয়া"র এক ঝাঁক কবিতায় নাকি একসময় সুর দিতে শুরু করেছিলেন কবি—এ-কথার ভাবে মনে হয়—এ নিতান্ত সচেতন শিল্পপ্রয়াস। "মহুয়া"র অনেকগুলো কবিতা রচনাতেও নাকি ছিল এই সচেতন সাধনা। গীতরূপে প্রচলিত পদকে গাম্ভীর্য দিয়ে-ছন্দোগত পূর্ণতা দিয়ে তিনি কবিতার রূপ দিয়েছিলেন।[১২] তাছাড়া, 'রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে প্রেমের কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া বিবাহ উপলক্ষ্যে উপহার দেওয়া যায় এইরূপ একখানি বই বাহির করা হইবে, এবং কবি এই বইয়ের উপযোগী কয়েকটি নূতন কবিতা লিখিয়া দিবেন'[১৩]—এইরকম পরিকল্পনা থেকে "মহুয়া" কাব্যগ্রন্থের উৎপত্তি। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই সচেতন প্রয়াস সম্পর্কে সংশয়গ্রস্তভাবে লিখেছিলেন—'লেখার বিষয়টা ছিল সঙ্কল্প করা—প্রধানত প্রজাপতির উদ্দেশ্যে —আর তাঁরই দালালী করেন যে-দেবতা তাঁকেও মনে রাখতে হয়েছিল।'[১৩] কবির ভয় হয়েছিল 'ফরমাশের ধাক্কা'য় শুরু হওয়া রচনাতে 'চিরন্তনী প্রেরণা'র অভাবে বুঝি জীবনের অপ্রতুল ঘটবে। কিন্তু পরেই নতুন ক'রে ভেবে বলেছেন—'ফরমাশ ব্যাপারটা মোটর গাড়ির স্টার্টার-এর মতো। চালনাটা শুরু করে দেয় কিন্তু তারপরে মোটরটা চলে আপন মোটরিক প্রকৃতির তাপে। প্রথম ধাক্কাটা একেবারেই ভুলে যায়। মহুয়ার কবিতাগুলিও লেখবার বেগে ফরমাশের ধাক্কা নিঃসন্দেহেই সম্পূর্ণ ভুলেছে—কল্পনার আন্তরিক তড়িৎ-শক্তি আপন চিরন্তনী প্রেরণায় তাদের চালিয়ে নিয়ে গেছে। প্রথম হাতল ঘোরানো হোতেও পারে বাইরের থেকে, কিন্তু সচলতা শুরু হবামাত্রই লেখবার আনন্দই সারথি হয়ে বসে'।[১৩]

---

১১. 'আমার/নীরব বেলা সেই তোমারি সুরে সুরে / ফুলের ভিতর মধুর মতো উঠবে পুরে'। 'তোমার সুরের ধারা' গানের সঞ্চারী অংশ। কবির ভাষাতেই কবির রচনার আলোচনা।
১২. 'রবীন্দ্র চর্চা প্রকল্পের' শ্রীকানাই সামন্ত এ তথ্য জানিয়েছেন।
১৩. প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ রচিত "মহুয়া" গ্রন্থের 'পাঠ পরিচয়', পুনর্মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৩৪৫

এই বক্তব্যের প্রস্তাবক্রমে, কবিতাকে গান করবার ব্যাপারেও, আরম্ভে সচেতন প্রয়াস থাকলেও পরে শিল্পীচিত্তের আনন্দই সৃষ্টিপথে সারথ্য গ্রহণ করেছে বলতে হবে। শুধু "মহুয়া" নয়, "মানসী"র 'তবু', 'ভুলে'; "ক্ষণিকা"র 'কৃষ্ণকলি', 'অবিনয়', 'নববর্ষা' 'আষাঢ়', 'মেঘমুক্ত'; "খেয়া"র 'গোধূলি লগ্ন'; "বলাকা"র 'তুমি কি কেবল ছবি', 'আজ প্রভাতের আকাশটি এই', 'মোর গান এ'রা শৈবালেরই দল'; "পূরবী"র 'পঁচিশে বৈশাখ', 'আনমনা'; "পরিশেষ" কাব্যের 'প্রবাসী'; "নবজাতকে"র 'উদ্বোধন' ইত্যাদি কবিতার অধিকাংশে সুরারোপের কারণ কোনো-না-কোনো প্রয়োজন। তাই বলা যায় এ গানগুলি তাঁর সচেতন শিল্পকর্ম। রূপরচনার প্রয়োজন বা প্রেরণা বোধেও তিনি গান থেকে হওয়া কবিতাকে আবার গান ক'রে দেখেছেন।

'আমার নয়ন তোমার নয়নতলে' গানটির মধ্যে যে-সারল্য চোখে পড়ে তা প্রধানতঃ ভাষার সরলতা। সুরের ছাঁদে আবার ভাবের বীচিভঙ্গ অনুভব করা যায়। পরবর্তী রচনা 'আমার নয়ন তব নয়নের' গানটিতে ভাবের খেলা তা ব'লে কিছুমাত্র কম নয়। উদ্দিষ্ট আবেগ মনের কাছে স্পষ্ট হয়েও রচনার উৎকর্ষ সাধনে কোনো বাধা হয়ে না-দাঁড়ালে, শিল্পগঠনে মনোনিবেশ সম্পূর্ণ ও উপযুক্ত হ'তে পারে। মনে হয়, পরিণত চিত্ত হৃদয়াবেগ এবং শিল্পদক্ষতা উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম হয়েছে ব'লেই দ্বিতীয় গানটির এই উৎকর্ষ সম্ভব হয়েছে। পূর্বকালের রচনা অপেক্ষা ধীশক্তি এবং কুশলতার স্বাক্ষর পরবর্তী রচনাতেই বেশী পড়া অস্বাভাবিক নয়। এইজন্য পরস্পর তুলনা করতে গেলে 'আমার নয়ন তোমার নয়নতলে' গানটিকে 'আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়' গানটির তরলিত সংস্করণ মনে হ'তে পারে। তবে ভাবের গাঢ়তা সাধনের জন্যই রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী সুর বেঁধেছেন, এতদূর না-ভাবাই ভালো। শিল্পরচনার খেয়ালেই, পরিণত ক্ষমতার জন্য দ্বিতীয় সৃষ্টি এ রকম হয়েছে বলা যায়। সহজ ভাষায় যে সুর খেলেছে, কবিতার গাম্ভীর্য তা থেকে স্বতন্ত্র সুর আহ্বান করেছে তার গীতরূপায়ণে। প্রথম গানটির নাটকে সন্নিবেশের ব্যাপারও বিচারের ক্ষেত্রে স্মরণে রাখা সমীচীন।

১৩৩৩ সালের ভাদ্র মাসে "নটীর পূজা" নাটকটি প্রকাশিত হয়। এ-নাটকের উপ-সংহারে নটীর পূজাভাবের নৃত্যগীতের গান হিসেবে 'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো' গানটি সন্নিবেশিত আছে। '27' সংখ্যক রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপিতে এই গানটি পাওয়া যায় 'আজি এই মম সকল ব্যাকুল/অঙ্গ মাঝে' কবিতাটির পূর্ব পৃষ্ঠায়। কবিতার নিম্নভাগে আবার ছোটো হরফে গানের শেষাংশের পাঠান্তর লিপিবদ্ধ রয়েছে :

কানন হতে তুলিনি ফুল মেলেনি মোরে ফল
কলস আমার শূন্য আছে ভরিনি তীর্থজল
আমার আপন তনুতে বাঁধনহারা
হৃদয় ঢালিল অধরা ধারা
তোমার চরণে হোক তা সারা পূজার পুণ্য কাজে।

শ্রীকানাই সামন্ত সম্পাদিত "বৈকালী"[১৪] গ্রন্থের 'গ্রন্থ-পরিচয়ে' রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি '27' অবলম্বনে গ্রথিত 'বর্তমান' বৈকালী প্রসঙ্গে গান ও কবিতার সামগ্রিক সূচীপত্র'তে পরপর সাজানো পদের রচনাকালের নির্দেশ লক্ষ্য করলে দেখা যায় পাণ্ডুলিপিতে রচনার ক্রম রক্ষিত হয়েছে। সেই অনুযায়ী 'আজি এই মম সকল ব্যাকুল' 'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো'র পূর্বে রচিত হয়েছে বলে ধরা যায়। কবিতার তারিখ 'বৈশাখ ১৩৩৩'।

১৪. বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের পঞ্চাশবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে। [৩২ আষাঢ়, ১৩৮১ : ১৭ জুলাই ১৯৭৪] প্রকাশিত

''বৈকালী'' গ্রন্থ-পরিচয়ের উক্ত তালিকায় আলোচ্য দুটি পদের পূর্বে বিন্যস্ত একটি গানের তারিখ '৭ বৈশাখ ১৩৩৩' এবং পরে বিন্যস্ত গানের তারিখ '৮ বৈশাখ ১৩৩৩'। এ-থেকে আন্দাজ করা যায় ৭ এবং ৮ বৈশাখের মধ্যেই আলোচ্য কবিতা এবং গান উভয়ের রচনা।

এ দুটি রচনা সম্পর্কে একসঙ্গে আলোচনা উত্থাপনের কারণ পদ দুটির সাদৃশ্য। কবিতার প্রথম স্তবক এবং দ্বিতীয় স্তবকের প্রথমাংশের সঙ্গে যথাক্রমে গানের প্রথম ও শেষ অংশের মিল অনেক।[১৫]

দুই পদেরই নিবেদন 'নিরুপম'-র কাছে। স্তবের আবেগে ছন্দ জেগেছে দেহে। বাহির থেকে বন্দনার উপচার সংগ্রহ করা হয়নি, সর্বস্ব নিবেদনের জন্য হৃদয়ের অধীর আবেগ অঙ্গে অঙ্গে তরঙ্গ-হিল্লোল তুলেছে। এই সর্বসমর্পণ যেন কোনো অসমাননা না পায় দুই পদের মাঝামাঝি জায়গাতে এমন আবেদন উচ্চারিত হয়েছে। আরাধনার জন্য নৃত্যারতির মধ্যে ঐকান্তিক ভক্তির ভাব মূল উপজীব্য বিষয়।

পূর্ববর্তী রচনা কবিতা ব'লে তাতে ছন্দ নিশ্ছিদ্র রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় রচনা গান ব'লে, সম্ভবতঃ সুর সহযোগে গঠিত ব'লে, প্রতি পর্ব পূর্বাপর একরকম থাকেনি। গানের পদে ভাব কিন্তু ভারি স্বচ্ছন্দ গতি পেয়েছে। মনে হতে পারত, মাত্রা গণনা ক'রে ছন্দ বজায় রাখবার দায়ভার ছিল না বলেই এমন হল। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অমন হঠকারী ধারণা করা যায় না, আর, আরো পরবর্তী রূপান্তরে সুনিবদ্ধ ছন্দে ভাবের সৌষ্ঠব দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে মাথা নত করতে হয়।

মনে রাখা ভালো, প্রথম গীতরূপটি নাটকের প্রয়োজনে রচিত সংস্করণ। সেখানে পূজার প্রয়োজনীয় ভাষা 'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমো' (অথবা, পাণ্ডুলিপির বানানে—'আমায় ক্ষম হে ক্ষম, নমো হে নমঃ')—কবিতার প্রথম অংশে বিন্যস্ত সৌন্দর্যকে রক্ষা করতে পারেনি। 'আজি এই মম সকল ব্যাকুল/অঙ্গ মাঝে/ ওহে নিরুপম তোমার স্তবের/ছন্দ বাজে।।' —কবিতা হিসেবে অধিক আদরণীয়। নাটকের প্রাসঙ্গিকতার জন্য পরবর্তী রূপে ক্ষমা প্রার্থনা ও প্রণতির ভাষা ব্যবহার অপরিহার্য হয়েছে। কিন্তু এ-ছাড়া কবিতার পরবর্তী অংশের তুলনায় গানের পদ অনেক বেশী ভাববহ মনে হয়। 'দিনু পূজা মম, নাহি যদি লও/মরিব লাজে'-র ওই স্পষ্ট বাচনের চাইতে 'আমার সব চেতনা সব বেদনা রচিল এ যে কী আরাধনা—/তোমার পায়ে মোর সাধনা মরে না যেন লাজে' অনেক বেশী ব্যঞ্জনাময়।

কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে পূজার অর্ঘ্য হিসেবে ফুল ফল তীর্থজলের পরিবর্তে পূজারিণীর দেহে উচ্ছলিত রসধারার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'অধীরতা তার তোমারি মাঝারে হোক্ না সারা'। অভিনিবেশ দিয়ে দেখলে কবিতার এই অংশে ভিন্নরসের আভাস পাওয়া যায়। 'আমার আপন তনুতে উছলে/ অধরা ধারা,/ অধীরতা তার তোমার মাঝারে/হোক্ না সারা।/ ঘনযামিনীর আঁধারে যেমন/জ্বলিছে তারা/দেহ ঘেরি মম প্রাণের চমক/ তেমনি রাজে'।—এই কথাগুলির পরে 'ওহে নিরুপম, তোমার স্তবের/ছন্দ বাজে।।' এই পংক্তি পূর্ববর্ণিত ভাবকে ফিরে স্মরণ না করালে বক্তব্য যেন ভিন্ন গতি পায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের জন্য এই কবিতার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ পূজাভাবের প্রণতিমূলক গানটি রচনা করেছিলেন।

---

১৫. 'বৈকালী' : গ্রন্থপরিচয় পৃ. ৯৬-৯৭ দ্রষ্টব্য

পূজা এবং স্তব প্রেমের ক্ষেত্রেও সঙ্গত। কবিতাটিতে তীর্থবারির প্রসঙ্গ বাস্তবিক পূজার সঙ্গে কবিতার বক্তব্যের যোগ নির্দেশ করেছে। তবু কোথায় একটা বিভাজন রেখা ছিল ব'লেই বোধকরি ১৩৩৫ সালের ২৫ শ্রাবণ তারিখে রবীন্দ্রনাথ ওই কবিতার চেহারা পাল্টে 'বরণডালা' সাজালেন।[১৬] এ রূপে তীর্থজলের কথা পরিত্যক্ত হোল। 'নিরুপম' হয়ে উঠল পরিষ্কার 'প্রিয়তম'। 'স্তব' নয়, প্রিয়কে বরণ করবার জন্য 'বরণের ডালা' হয়েছে আবেগস্পন্দিত ছন্দোময় দেহ। 'আজি এ নিরালা কুঞ্জে, আমার/ অঙ্গ-মাঝে/বরণের ডালা সেজেছে আলোক-/ মালার সাজে'। 'দিনু পূজা মম'-প্রসঙ্গ এখানে হয়েছে 'এ বরণ-গান নাহি পেলে মান/ মরিব লাজে'। এ-কবিতার 'অর্ঘ্য' এবং 'পূজা'-প্রসঙ্গ প্রেমের বন্দনা হিসেবে দেশীয় ধারার সঙ্গে একাত্ম—'অর্ঘ্য তোমার আনি নি ভরিয়া/ বাহির হতে,/ ভেসে আসে পূজা পূর্ণ প্রাণের/ আপন স্রোতে | /মোর তনুময় উছলে হৃদয় / বাঁধন হারা, / অধীরতা তারি মিলনে তোমারি / হোক না সারা'। 'অধীরতা তার তোমার মাঝারে/হোক্ না সারা' পংক্তির বক্তব্য এখানে আরো স্পষ্ট হোল—'অধীরতা তারি মিলনে তোমারি | হোক না সারা'।

রচনার ক্রম লক্ষ্য করলে, রূপান্তরের বীজ প্রথম কবিতাতেই ছিল, এমন ধারণা জোর পায়।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ১৩৪১ সালের ভাদ্র সংখ্যা থেকে 'আজি এ নিরালা কুঞ্জে' কবিতার স্বরলিপি সংগ্রহ ক'রে ছাপা হয়েছে "স্বরবিতান" চতুঃপঞ্চাশোত্তম খণ্ডে।[১৭] শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন—'১৩৪০ সালে ফাল্গুন মাসে বড়ো কবিতায় সুর দেবার বিশেষ ঝোঁক তাঁর মনে দেখা দিয়েছিল। এই মাসের শেষ সপ্তাহে একটানা 'মহুয়া'র সাতটি কবিতায় সুরযোজনা করেন; কীর্তনের সুরে 'আজি এ নিরালা কুঞ্জে'।[১৮]

গানে মাত্র দুইটি স্থলে পরিবর্তন পাই। 'আমার দেহের বাণীতে যে দোল/ উঠিছে দুলে' বদল করে করা হয়েছে 'আমার দেহের বাণীতে সে গান/উঠিছে দুলে'। পরের পংক্তিতে বলা হয়েছে 'এ বরণ গান নাহি পেলে মান'। পূর্ব পংক্তির 'সে দোল'কে যখন 'এ বরণ গান' বলা হচ্ছে, তখন 'দোল'কে 'গান' ক'রে ফেলা সঙ্গত হয়েছে। গানের পদে বলা হল, প্রকৃতিসৌন্দর্যে যে-বাণীর হিল্লোল—'দেহের বাণী'তে তা গান হয়ে তরঙ্গিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় পরিবর্তন, 'ঘন যামিনীর আঁধারে যেমন/ঝলিছে তারা' বাক্যের 'ঝলিছে' শব্দকে কোমল করা হয়েছে 'জ্বলিছে' বলে। সামান্য অর্থভেদ ঘটলেও এ তেমন গুরুতর ভেদ নয়। 'জ্বলিছে' উচ্চারণে এক মাত্রায় পর পর গান্ধার ও মধ্যম স্বরের ব্যবহার সুরে একটা উৎক্ষেপের ভাব এনে অন্ধকারের পটভূমিতে তারকার ঔজ্জ্বল্য ব্যক্ত করে। 'ঝলিছে' শব্দকে সুরে বসাতে কোনো অসুবিধা ছিল এমনও মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ এর চাইতে অনেক দুর্দান্ত শব্দ গানে ব্যবহার করে গেছেন। তবে, সংগীতে মহাপ্রাণ ধ্বনি বেশী প্রকট হয়ে অনেক সময় কর্ণপীড়া সৃষ্টি করতে পারে বটে।

'আজি এ নিরালা কুঞ্জে' গানটির ইতিবৃত্ত থেকে বোঝা যায় যে, প্রথম কবিতা রচনার পর তাকেই আবার নতুন ক'রে লিখতে গিয়ে পরে পরে কয়েকখানি শিল্পসৃষ্টি হয়েছে।

---

১৬. "মহুয়া"

১৭. প্রকাশ : ফাল্গুন, ১৮৭৯ শক। ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮

১৮. "রবীন্দ্রসংগীত", পৃ. ১৭৩

শেষ গানটি অবশ্য নিতান্তই কবিতাকে সুরে বসাবার খেলা থেকে তৈরী, সচেতন অথচ অহৈতুক শিল্পলীলার জাতক। ''মহুয়া'' কাব্য থেকে সৃষ্ট পরবর্তী সাতখানি গানে রবীন্দ্রনাথ শিল্পীর নিরাসক্তিতে সুরের খেলা খেলেছেন বলা যায়। এই সাতটি গান হচ্ছে— 'বাহির পথে বিবাগী হিয়া', 'অজানা খনির নূতন মণির', 'প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায়' 'আজি এ নিরালা কুঞ্জে', 'আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা,' 'আমার নয়ন তব নয়নের' এবং 'আরো কিছুখন না হয় বসিয়ো পাশে'।

'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো' গানটিতে সুরে কোমল স্বরের প্রাধান্য। কেবল ভক্তির আবেগ জাগাবার জন্য নয়, পূজাশেষে যে চরম আত্মনিবেদন অপেক্ষা ক'রে আছে, তার পটভূমি রচনার জন্যেও, হয়তো। সুরকে নানা ভঙ্গী দিয়ে সংগীতের চলনেও নৃত্যময়তা সংগ্রন্থন করা হয়েছে, গানের সম্পূর্ণ ভাবকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য। প্রতিবার মুখে ফিরবার আগের দীর্ঘতান ছন্দোভঙ্গিমায় ব্যাকুল আত্মনিবেদনের সুর ধ্বনিত করে। বদ্ধধ্বনির সংঘাতে সৃষ্ট অনুপ্রাসে, ভাব ছন্দে লীলায়িত ভঙ্গী পেয়েছে—'নৃত্যরসে চিত্ত মম' বা 'বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ সঙ্গীতে বিরাজে' ইত্যাদি খণ্ডে। দ্বিতীয় অনুপ্রাসটি আবার অনুনাসিক ধ্বনির দরুণ সাংগীতিক গুণে আপাতসৃষ্ট বদ্ধতাকে অতিক্রম ক'রে মাধুর্য বিস্তার করে। পংক্তিমধ্যবর্তী পর্বান্তের বা পর্বমধ্যের অনুপ্রাস ও ছন্দোলীলার সহায়তা করেছে, যেমন, 'নৃত্য রসে চিত্তমম', 'ডাইনে বামে ছন্দ নামে', 'পরম ব্যথায় পরাণ কাঁপায়,' 'সব চেতনা সব বেদনা', 'কলস মম শূন্য সম' ইত্যাদি। 'উছল হয়ে বাজে', 'নব জনমের মাঝে', 'মরে না যেন লাজে' এবং 'পূজার পুণ্য কাজে'—অংশে সুরের উচ্চারণে, একস্থানে ছাড়া অন্য কোথাও বদ্ধধ্বনি না-থাকাতে সুরের স্বচ্ছন্দ বিচরণ নিকটে বিন্যস্ত বদ্ধধ্বনির সংঘাতের বিপরীতে ছন্দোময় আলপনা আঁকে। 'পুণ্য' উচ্চারণে যুক্তধ্বনির বদ্ধতা দৃঢ়নিবদ্ধ নয়। অনুনাসিক ধ্বনি 'পুণ্য', উচ্চারণে পরোক্ষ মুক্তি রেখেছে ব'লে এ-বদ্ধতা মুক্তধ্বনিতে সুর খেলানোর কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে না।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, 'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো' গানটিতে শিল্প-সাফল্যের পরিচয় সামান্য নয়। সম্পূর্ণ গানটির ভাবনিষ্পত্তিতে বাণীর ধ্বনিগত সহায়তা এবং চলনের আনুকূল্য বিশেষ মূল্যবান।

'আজি এ নিরালা কুঞ্জে' গানটিতে—কুঞ্জবনে প্রতীক্ষারতা সুসজ্জিতা প্রেমিকার নিবেদনে কীর্তন সুরের মিশ্রণ থাকলেও, সে-সুর আগাগোড়াই যেন থেকে থেকে আবহ সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হয়েছে শুধু। আর তাছাড়া, বাণীর রূপায়ণের প্রয়োজনে সুর অন্যধারায় চলেছে। প্রেমের পরিবেশ রচনায় প্রয়োজন মতো কীর্তনের সুর ব্যবহার ক'রেও, সামগ্রিক ভাবে, শিল্পী আপনার মতো সুরসৃজন ক'রে চলেছেন। তাই এ সুরে দেশীয়ধারা আত্মীকরণের পরিচয়। এ-গানকে কীর্তন না ব'লে রবীন্দ্রসংগীতই বলতে হবে। রবীন্দ্রসংগীত বলতে হবে 'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো'-কেও। তবে উভয়ের মধ্যে তুলনায় সুরের দিক থেকে রবীন্দ্রবিশেষত্ব পরবর্তী সৃজনে অধিক প্রস্ফুট। বাণী রচনাতেও প্রথম গানের ক্ষেত্রে নাটকের প্রসঙ্গ ভাবের স্বতোৎসারকে অবশ্যই কিছু নিয়ন্ত্রণ করেছে। দ্বিতীয় গান অন্য বিবেচনার দায় খেয়াল রেখে সৃষ্ট হয়নি, ফলে, রূপসৃষ্টিই ঐকান্তিক লক্ষ্য হতে পেরেছে। আদি কবিতাটিতে ভাববীজ ছিল—পরের কবিতাতে তাকে উপযুক্ত মতো বিকশিত করা হয়েছে। সুরার্পণে ভাব অভিমুখী যাত্রায় তাই কেবল ধ্বনি সমন্বয়ের খেয়াল। আর ১৩৪০-এর ফাল্গুন নাগাদ ধ্বনিশিল্পে রবীন্দ্র-নাথ নিপুণতার বিশেষ স্তরে পৌঁছে গেছেন।

"পরিশেষ"[১৯] কাব্যের 'প্রবাসী' কবিতার একটি পাঠ পাই পাণ্ডুলিপি '27'-এ। সেখানে রচনাকাল লেখা আছে '২২ মাঘ ১৩৩২'। পাণ্ডুলিপি '28'-এ এ-কবিতার সামান্য পরিবর্তিত অন্য পাঠ পাই। এই পাণ্ডুলিপিতে চৈত্র ১৩৩২ থেকে ফাল্গুন ১৩৩৮ তারিখ পর্যন্ত রচনার খসড়া রয়েছে ব'লে 'রবীন্দ্রচর্চা প্রকল্পে'র প্রামাণ্য নথীতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্র-রচনাবলীর পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত সংস্করণে কবিতার তারিখ দেওয়া হয়েছে চৈত্র ১৩৩২। এ-তারিখ দুই পাণ্ডুলিপির কোনোটিতেই কবিতার নীচে লেখা নেই। কোন্ তথ্য অনুযায়ী পাণ্ডুলিপিতে নির্দিষ্ট তারিখ থেকে এই কবিতার রচনাকাল ভিন্ন ব'লে ধরা হয়েছে পরিষ্কার বোঝা যায় না। পাণ্ডুলিপি '28'-এ চৈত্র ১৩৩২ থেকে রচিত কবিতার খসড়া রয়েছে ব'লেই কি এ অনুমান? পাণ্ডুলিপি '27'-এর পাঠই "পরিশেষে" মুদ্রিত 'প্রবাসী' কবিতার নিকটতর রূপ। '28' নং পাণ্ডুলিপির সঙ্গে বরং কবিতার সংগীত পাঠান্তরের মিল বেশী। শান্তিদেব ঘোষের "রবীন্দ্রসংগীত" গ্রন্থে আবার অন্য তারিখ পাচ্ছি—'১৩৩৩ সালে, 'প্রবাসী' পত্রিকার পঁচিশ বৎসর পূরণের আশীর্বাদ-স্বরূপ, গুরুদেব একটি বড়ো কবিতা লিখেছিলেন—'পরবাসী চলে এসো ঘরে, অনুকূল সমীরণ ভরে' (পৃ.২০৭)। ১৩৩৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে কবিতাটি মুদ্রিত হওয়াতে রচনা ১৩৩৩-এ মনে করা হয়েছে হয়তো।

১৭ জুলাই ১৯৭৪ সনে প্রকাশিত "বৈকালী" গ্রন্থপরিচয়ে 'রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি ২৭ বর্তমান বৈকালী প্রসঙ্গে গান ও কবিতার সামগ্রিক সূচীপত্রে' কবিতা রচনার তারিখ ২২ মাঘ ১৩৩২ বলেই নির্দেশ করা হয়েছে। পাণ্ডুলিপি সমর্থিত এই তারিখই গ্রহণযোগ্য মনে করা যায়। "বৈকালী"র গ্রন্থপরিচয়ে[২০] এই কবিতার দুই গীত পাঠান্তর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। গান দুটি প্রথম সংস্করণের 'গীতবিতানে'র তৃতীয় খণ্ডে সঙ্কলিত হয়েছে। ধরে নেওয়া যায় ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত 'প্রবাসী' কবিতা ভেঙে 'পরবাসী চলে এসো ঘরে' এবং 'এসো এসো প্রাণের উৎসবে' গান দুটি রচনা করা হয়নি।

দুখানি গানই "স্বরবিতান" প্রথম খণ্ডে[২১] প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম গানটির পদ রচনায় কবিতার পরের পংক্তি আগে এবং আগের পংক্তি পরে ইচ্ছে মতো ওলটপালট ক'রে সাজানো। এ ছাড়া শেষ পংক্তিতে 'পরবাসী বাহিরে-অন্তরে' স্থলে 'নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে' পাঠ দেওয়া হয়েছে। গানের পদ দীর্ঘ করতে চাননি ব'লে হয়তো মূল বক্তব্য ধ'রে রেখেছে এমন কয়েকটি পংক্তি চয়ন ক'রে ভাবের ধারা বজায় রেখে সাজিয়ে নিয়েছেন। ছোটো ছোটো পংক্তিতে গানের পদটির চেহারা বেশ ছিমছাম হয়েছে। ক্ষোভ বা তিরস্কার বা উপদেশের বচন গানে পরিত্যক্ত। এই চেহারায় কবিতা হিসেবেও এর রূপ খুলে গেছে, ভার লাঘব হ'য়ে ব্যঞ্জনার সঞ্চরণ অবাধ হয়েছে। শেষ পংক্তির 'নির্বাসিত'-শব্দ অর্থের ব্যঞ্জনাতেও যেমন নূতন দীপ্তি আনে, গানের সুরেও তেমনি, আরম্ভের বন্ধধ্বনিতে ঠেকে গিয়ে বলিষ্ঠতা সঞ্চার করে।

ঘরে ফেরার আহ্বানে এবং খেয়া পারাপারের কথায়-ও কেন যেন, একটি সন্ধ্যার ছবি 'পরবাসী'তে জেগে ওঠে। সন্ধ্যার সুর হিসেবে বিদিত ইমনকল্যাণ রাগের 'রং'[২২] এখানে ইপ্সিত ভাব ব্যক্ত করবার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।

---

১৯. প্রকাশ : ১৩৩৯ ভাদ্র

২০. পৃ. ১০৩-৫

২১. প্রকাশ: ১৩৪২ ভাদ্র

২২. সত্যজিৎ রায়, 'এক্ষণ', ১৩৭৪ কার্তিক-অগ্রহায়ণ পৃ. ১০-১১ দ্রষ্টব্য

কবিতার প্রথমাংশের ম্লান কণ্ঠস্বর এবং ক্ষোভের ভাব, শেষাংশে উৎসাহের ভাব সঞ্চারে চাপা পড়ে গেছে। শুভদিনকে যে-পরবাসী বারে বারে অর্থহীন ক'রে দিয়েছে, আমন্ত্রণের মাঙ্গলিক-স্বরূপ আলপনাচিহ্ন যার চোখেই পড়লো না—প্রথম দিকের তিরস্কারের সুর ছেড়ে শেষ ভাগে তাকে বীর সম্বোধনে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলা হচ্ছে। ফসল-ভরা মাঠের আহ্বান পূর্বে যে গ্রহণ করেনি, তাকেই পরে মাটির উৎসব বা প্রাণের উৎসবে আহ্বান ক'রে সংবাদ দেওয়া হয়েছে 'দুঃখ আছে অপেক্ষিয়া দ্বারে'। আরো বলা হোল—সে-দুঃখ সেই বীরের বরণীয় বা বীরের বক্ষোশোভা —'ঝটিকার মেঘমন্দ্র স্বরে' যে-বীরের আগমন ঘটতে পারে।

কবিতার সূচনার সুরের ক্লান্তি সন্ধ্যার সুরের অনুকূল, কিন্তু বোধনের সুর সম্পূর্ণ ভিন্ন। কবিতার আরম্ভে যদি থাকে সন্ধ্যা তো উপসংহারে নবপ্রভাত। 'এসো এসো প্রাণের উৎসবে' গানে তাই ভৈরোঁর তান লেগেছে।[২৩]

শিক্ষানবিশী কালে রবীন্দ্রনাথ রাগ-রাগিণীর ভাবসন্ধানে রত ছিলেন। সেই ভাবের প্রতি লক্ষ্য করবার কথা বলতেন—'আমাদের রাগরাগিণীর মধ্যে একটা ভাব আছে, তাহা যাইবে কোথা বলো। ...সংগীতবেত্তারা সেই ভাবের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করুন। কেন বিশেষ-বিশেষ এক-এক রাগিণীতে বিশেষ-বিশেষ এক-একটা ভাবের উৎপত্তি হয় তাহার কারণ বাহির করুন।[২৪] সন্ধান করতে করতে রাগিণীর ভাবের পাকে তিনি নিজে জড়িয়েছেন। ব্যাপারটিকে না জানলে তা থেকে উত্তীর্ণই বা হবেন কি ক'রে। যে বিশিষ্ট গানে বা সুরে মন মজেছে, তার ভাবটি আয়ত্ত ক'রে তার সুরে সুর মিলিয়ে গান বেঁধে রাগের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়েছেন তিনি। ১২৮৮-র মাঘে তিনি আবার সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন—'...সংগীতে কতকগুলা নাম ও নিয়মের মধ্যেই যেন বদ্ধ হইয়া না থাকি। ...সন্ধ্যা বিষয়ে গান রচনা করিতে গেলে রচয়িতা যেন চোখ কান বুজিয়া পূরবী না গাহিয়া যান—যেন সন্ধ্যার ভাব কল্পনা করেন—তাহা হইলে অবসান দিবসের ন্যায় তাঁহার সুরও আপনা-আপনি নামিয়া আসিবে, মুদিয়া আসিবে, ফুরাইয়া আসিবে'।[২৫]

এইজন্য রাগের ভাবসন্ধানী শিল্পী 'চোখ বুজিয়া' রাগরাগিণী প্রয়োগ ক'রে ভাব বিকশিত করতে চাননি। আপন ভাব তার সঙ্গে মিশিয়েছেন। আর, রাগরাগিণীর প্রভাবকে—'রাগরাগিণীর টুকরাগুলি'তে[২৬] আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। বলেছেন—'যেভাবেই গান রচনা করি এই রাগ রাগিণীর রসটি তার সঙ্গে মিলিয়া থাকিবেই। আমাদের রাগিণীর সেই সাধারণ বিশেষত্বটি কেমন? যেমন আমাদের বাংলাদেশের খোলা আকাশ। এই অবারিত আকাশ আমাদের নদীর সঙ্গে, প্রান্তরের সঙ্গে, তরুচ্ছায়ানিভৃত গ্রামগুলির সঙ্গে নিয়ত লাগিয়া থাকিয়া তাদের সকলকেই বিশেষ একটি ঔদার্য দান করিতেছে। ...তেমনি আমাদের দেশের গান যেমন করিয়াই তৈরি হোক-না কেন, রাগরাগিণী সেই সর্বব্যাপী আকাশের মতো তাহাকে একটি বিশেষ নিত্যরস দান করিতে থাকিবে।'[২৭]

---

২৩. 'ভৈরোঁ যেন ভোরবেলার আকাশেরই প্রথম জাগরণ'। 'সংগীত চিন্তা', পৃ. ৫৩

২৪. "সংগীত-চিন্তা", পৃ. ৫। রচনা: জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮

২৫. "সংগীত-চিন্তা", পৃ. ২৫-২৬

২৬. "সংগীত-চিন্তা", পৃ. ৬১। রচনা: ভাদ্র ১৩২৪

২৭. 'সংগীতের মুক্তি', "সংগীত-চিন্তা" পৃ. ৬১-৬২

কোনো বিশেষ রবীন্দ্রসংগীত কেন রাগসংগীত মনে করায় না, এই রকম তর্ক তাই অর্থহীন মনে হয়।[২৮] সেই সমালোচনার ভাবে মনে হয়, সমালোচক যেন রাগরাগিণীর পক্ষপাতী হয়ে সহসা রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়েছেন। গানে সুরকে রবীন্দ্রনাথ অবহেলা করেননি, রাগিণীর টুকরোও ব্যবহার করেছেন রচনায়। কোনোটিকে প্রধান করা নয়—ব্যঞ্জনার বিষয়ে সিদ্ধি অর্জনের জন্য সমন্বয়ের সাধনা তাঁর, এতো সকলেই জানেন। রাগসংগীতকে মনে করবার সাধনা নয়, 'ভাব ও ছন্দ' অথবা 'রাগ ও ছন্দ' কোনোটিকেই দাবিয়ে রাখবার সাধনা নয় তাঁর।[২৯] 'খাঁটি রবীন্দ্রসংগীত' রচনাই তো তাঁর উদ্দেশ্য।

'প্রবাসী' কবিতার দশম স্তবকটি বাদ দিয়ে সপ্তম অষ্টম ও নবম স্তবক নিয়ে প্রস্তুত 'এসো এসো প্রাণের উৎসবে' গানটিতে কবিতা থেকে পরিবর্তন যৎসামান্য। 'মাটির উৎসবে' প্রাণেরই লীলা ব'লে 'প্রাণের উৎসবে' পরিবর্তন ভালো লাগে, অর্থও ব্যাপ্তি পায়। 'ফিরে এসো' কথাটির মধ্যে চলে-যাওয়া কাউকে ফিরিয়ে আনবার প্রসঙ্গ—একটু অতীত স্মৃতির শ্বাস ফেলে। গানরূপের সজীবতা 'ফিরে এসো'-র চাইতে ভারমুক্ত 'এসো এসো'-তে অধিক পরিস্ফুট। এ-গানটিতে যেন কবিতা থেকে ছিঁড়ে নিয়ে নূতন জীবন দেওয়া হয়েছে। আর একটি পরিবর্তন আছে—'বীর, তুমি বরি' লহো তারে' স্থলে 'বীর, তুমি বক্ষে লহো তারে'। দুঃখকে বরণ করতে বললে তার সঙ্গে যে দূরত্ব রক্ষা হয়, গানে সে দূরত্ব স্বীকার না ক'রে, দুঃখকে প্রিয় ক'রে নিতে বলা হল। কবিতা থেকে চ্যুত হয়ে এই পদটিও লেখনীর ছোটোখাটো আঁচড়ে ভাবে ভিন্ন হয়ে উঠেছে। গানটি "গীতবিতানে"র 'আনুষ্ঠানিক'-পর্যায়ে স্থান পেয়েছে, কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষেই এটি রচিত হয়ে থাকবে।

কবিতার দুপ্রান্ত থেকে দু-অংশ সরিয়ে নিয়ে দুটি পরস্পর-সম্পর্ক-বিরহিত গান রচনাতে শিল্পলীলার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে অনেক সময়েই তিনি নতুন পদ না বেঁধে—পুরোনো কবিতাকেই কিছু সেরে সংগীত শিল্পের উপযোগী ক'রে নিয়ে নতুন গান তৈরি করতেন। এ-ভাবে "বলাকা" কাব্যের 'তুমি কি কেবল ছবি' হয়েছে 'তুমি কি কেবলি ছবি' গান, এমন আরো আছে।

প্রয়োজন কখনো বাইরের, কখনো অন্তরের—প্রয়োজন একভাবে-না-একভাবে আছেই। অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'যে রচনার হেতু মাত্র আপনা হতে রসের উদয়, তাকে বলতে পারি অহেতুক রচনা। না হলে হেতু নেই কারণ নেই কোনো কিছুর নিমিত্তও নয় অথচ রচনা হল কিছু, —এমনটা হয় না।[৩০]

---

২৮. ১৩৭৪-এর কার্তিক-অগ্রাহয়ণ সংখ্যা "এক্ষণে" 'রবীন্দ্রসংগীতে ভাববার কথা' প্রস্তাবে 'পরবাসী, চলে এসো ঘরে' গানটি এবং আরো কিছু রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে সত্যজিৎ রায়ের অভিমত—'ইমনের রং আছে, কিন্তু এ গান রাগসংগীতের কথা মনে করায় না। এ হল খাঁটি রবীন্দ্রসংগীত। " কথার ভাব ও ছন্দ যেন গানের রাগ ও ছন্দের উপর কর্তৃত্ব করছে, তাদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে দাবিয়ে রাখছে। অথচ প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি বলে তাদের ফেলেও দেওয়া যায়নি। রাগের এই অপ্রতিভ চেহারাটা অনেক রবীন্দ্রসংগীতেই পাওয়া যায়। পৃ. ১০-১১

২৯. 'আমরা যে গানের আদর্শ মনে রেখেছি তাতে কথা ও সুরের সাহচর্যই শ্রদ্ধেয়, কোনো পক্ষেরই আনুগত্য বৈধ নয়। সেখানে সুর যেমন বাক্যকে মানে, তেমনি বাক্যও সুরকে অতিক্রম করে না। কেননা, অতিক্রমের দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির সামঞ্জস্য নষ্ট করা কলারীতি-বিরুদ্ধ।' "সংগীত-চিন্তা" পৃ. ৮৬-৮৭

৩০. "বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী", পৃ. ৩০২

ভারতবর্ষের বাইরে নৃত্যনাট্য দেখে এসে মনে তাগিদ জাগল, "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যনাট্যকে নিয়ে নৃত্যগীতিময় নাট্যরচনার জন্যে তিনি নতুন রূপ নির্মাণ শুরু করলেন। আগের তৈরি গান জুড়ে দেওয়া গেল কিছু, প্রয়োজনে অল্পস্বল্প বদল ক'রে নিয়ে। বাকী তৈরি করে নেওয়া হোল নতুন।

রবীন্দ্রনাথের বাণীপ্রধান গান হিসেবে বিশেষ উল্লেখ্য, আবার কবিতার গীতিরূপান্তর হিসেবে বিশিষ্ট রচনা 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি'। এ-ধরনের গানে গায়কের ভূমিকা কিছুটা যেন কথকের ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায়। এই কথকতার চরম বিকাশ 'কৃষ্ণকলি'তে। আগাগোড়া কবিতাটির কোথাও সাংগীতিকতা সাধনের জন্য হাত লাগানো হয়নি। 'কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ' বলবার আগে 'ও' ব'লে তান--পদের অঙ্গ নয়, উচ্ছ্বাস-প্রকাশক সুরবিস্তার।[৩১] কথকতার ভঙ্গিতে পূর্বাপর সবটুকু বলে যাওয়া হল—কখনো সুরে, কখনো কোথাও কোথাও গানের সুর ছেড়ে কথার সুরে।

রেকর্ডে কবিকণ্ঠে 'কৃষ্ণকলি'র আবৃত্তি ধরা আছে। তাতে যে-সব জায়গায় বিশেষ সুর লাগানো হয়েছে, তাতে নাটকীয়তা স্পষ্ট। 'আমার পানে দেখলে কিনা চেয়ে' বলা হোল হঠাৎ উঁচু সুরে, যেন সনিশ্বাসে। তারপরে গভীর সুর লাগিয়ে 'আমিই জানি'। তারপরেই আবার উঁচু সুরে শুরু ক'রে 'আর জানে সেই মেয়ে'। 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' বলতে 'আমি'তে সবসময়েই বিশেষ জোর। সেখানে নিজের রুচির কথা জোর দিয়ে বলা। 'কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক' পদে 'গাঁয়ের লোক' উচ্চারণে তাচ্ছিল্যের সুরে বোঝানো হয়েছে আর সাতজনে তাকে কি-না-কি বলে থাকে। 'আর যা বলে বলুক অন্যলোক' বলতেও ওই সুর লেগেছে। ময়নাপাড়ার মাঠের সেই আশ্চর্য দৃষ্টিবিনিময়কালের নির্জন পরিবেশের কথাটা হঠাৎ খুব গদ্যাত্মক খবরের ভঙ্গিতে বলা হোল 'আর ছিল না কেউ'। আবৃত্তিতে সবচেয়ে অবাক লাগে 'কালো হরিণ-চোখ' কথাটিকে 'কালো-হরিণ চোখ' বলতে শুনে। সাত সাতটি বার ওই এক অর্থ ক'রেই ও-অংশ বলা হল। গানের সুরে-ও 'কালো'-র পরে বিরাম না-রেখেই 'হরিণ চোখ' বলা আছে, তবু সুরের টানে 'কালো' যে 'হরিণ-চোখে'র বিশেষণ তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

আবৃত্তিতে একটি জায়গায় বাক্যের ক্রমভঙ্গ ক'রে ফেলেছেন কবি—'পুবে বাতাস এল হঠাৎ ধেয়ে' স্থলে বলেছেন 'পুবে বাতাস হঠাৎ এল ধেয়ে'। তাতে অবশ্য মারাত্মক বদল কিছু হয়নি। শুনতে ভালোই লাগে।

এ আলোচনায় আবৃত্তির এই প্রসঙ্গ আনবার কারণ—কথকতাও প্রায় আবৃত্তি। এবং রবীন্দ্রনাথের পাঠে অনেকস্থলেই টেনে টেনে সুর জাগিয়ে পড়বার নির্দর্শন আছে,[৩২] যা থেকে এ-কবিতার সুরের আকাঙক্ষা অনুভব করা যায়।

৩১. এই গানটির আলোচনায় স্বরলিপি নয়, শান্তিদেব ঘোষের রেকর্ড অনুসরণ করা হল। 'কারণ শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন—'১৯৩১ সালে বর্ষামঙ্গল উপলক্ষ্যে "ক্ষণিকা"র 'কৃষ্ণকলি' কবিতাটিতে সুর দিলেন কীর্তন ও নানা রাগিণী মিশিয়ে—বর্তমান লেখককে দিয়েই সেই পরীক্ষা চালালেন। গানের বাঁধা ছন্দকে ভেঙে আবৃত্তির ধরনটি বজায় রেখে আমাকে সর্বসমক্ষে গাইতে হল।' "রবীন্দ্রসংগীত', পৃ. ১৭০। সাক্ষাৎ শিষ্যের গায়নকে প্রামাণ্য হিসেবে ধরা চলে ব'লে ধারণা করি। "স্বরবিতান" ১৩-তে প্রকাশিত দিনেন্দ্রনাথের স্বরলিপি, তাঁর অন্য আরো নানা টানা গানের স্বরলিপির মতো গানের ঢঙ অনুযায়ী তৈরী নয়।

৩২. 'ময়না পাড়ার মাঠে—', 'গুচ্ছবেণী পিঠে—র্', 'সত্যি কালো চো—ক', 'দশ ঘরে। আঁধার হল দেখে—ডাকতেছিল—' 'কুটি—র্' 'বারে—', 'দেখেছি তা—র' ইত্যাদি।

কথায় সুর লাগলে তাতে গভীরতা সঞ্চার হয়েই থাকে। কারণ, সুর নাকি আবেগ-প্রকাশক।৩৩ তখন নাটকীয় লঘু সুর চাপা পড়তে বাধ্য। তাই 'ক্ষণিকা'র পরিহাসপ্রিয় কবির কণ্ঠের আবৃত্তির সঙ্গে গানের সুরের ভাবের পার্থক্য ধরা যায়। গানে 'আমি'তে ঝোঁক পড়ে না, পড়ে কেবল 'তারেই' পদে। সুরে 'আমি' ভেসে গিয়ে সেই মেয়ে হয়ে ওঠে কেন্দ্রীয় বিষয়, তাই 'তারেই' পদে ঝোঁক পড়ে। 'আমার পানে দেখলে কিনা চেয়ে' প্রসঙ্গে 'আমিই জানি' বলতে আবৃত্তিতে যেমন গভীর সুর লেগেছে—সুরে তেমনি লেগেছে মীড়। 'কালো কাজল মেঘ' বলতে সুরে শেষ পদে আবেগ উদ্বেলিত হয়। 'পুবে বাতাস' ধানের ক্ষেতে যে-ঢেউ খেলিয়ে যায়—তা আবৃত্তিতে প্রকাশের সুর পায় না—সুরে দুলে দুলে চ'লে ঢেউ তোলে।

আবৃত্তি ও গানে মিল একটি জায়গায়—যেখানে কালো রূপের বর্ণনা সুর হারিয়ে বিস্ময়-ভরা প্রশ্ন হয়ে ওঠে 'কালো ?'। গানে বেশ কয়েকটি জায়গায় শ্রুতি এবং মীড়ের প্রয়োগে অনির্বচনীয়তার ব্যঞ্জনা এসেছে—'মেঘলা দিনে'-র শেষে, 'আর জানে সেই মেয়ে' বলতে 'আর' উচ্চারণে, 'কালো কাজল মেঘ' -এর 'মেঘ', 'কোমল ছায়া'র 'ছায়া', 'আষাঢ়', এবং 'ময়নাপাড়ার' উচ্চারণের শেষে। 'কালো ?' প্রশ্নটি দুভাবে উচ্চারিত আছে—কখনো খাদে, কখনো একটু উঁচুসুরে, এ-সুর অবশ্য কথারই সুর।৩৪

সমস্ত গানটিকে কথকতার ঢঙে ঢেলে বাংলার মাটির সঙ্গে আপন নাড়ীর যোগের কথা প্রকাশ করেছেন শিল্পী। 'কৃষ্ণকলি' নায়িকা হয়ে উঠে গ্রাম বাংলার সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে শিল্পীর গভীর যোগের খবর ভালোরকম জানিয়ে দিলো এই অনন্য গান-খানিতে। বাংলার কীর্তনেও পালাগায়ক কখনো কখনো সুর ছেড়ে কথা বলেন। তাতে নাট্যভঙ্গিমা জাগে। 'কৃষ্ণকলি' গানটিতেও নাটকীয়তা এবং ভাবাবেগ সমগ্রভাবের প্রয়োজনমতো ক্রমিকভাবে প্রবাহিত হয়েছে। 'ঘন মেঘে আঁধার হল দেখে' স্তবকটির বিবৃতি সুরের আভাসমাত্র নিয়ে অগ্রসর হয়ে ধাপে ধাপে অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার উদ্বেগকে উচ্চারণ করেছে, পুরো-দস্তুর কথকতার চালে। কীর্তনের তান,৩৫ বাউলের 'শ্রুতি' আর সামগ্রিকভাবে কথকতার ভঙ্গিতে ভাব অনুগামী গতি—এইসবের সাহায্যে গানটির ভাবসম্পদ বিভাসিত হয়েছে। বাণীপ্রধান গানের ধারায় এ এক বিশেষ বিকাশ।

কবিতার গীতিরূপ প্রসঙ্গে 'উর্বশী' নিয়ে প্রবল বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রচলিত। 'উর্বশী' কবিতার প্রথম স্তবক এবং চতুর্থ স্তবকের প্রথম চার পংক্তির পর তৃতীয় স্তবকের শেষ পাঁচ পংক্তি নিয়ে অপর স্তবক তৈরি করে গান রচনা করা হয়েছে দেখতে পাই। সুর সন্নিবেশের জন্য যৎসামান্য পরিবর্তনও করা হয়েছে।৩৬ "গীতবিতানে"র ৯৮৮ পৃষ্ঠায় 'গ্রন্থপরিচয়ে' বলা আছে ১৩৪৭-এর পৌষে 'শাপমোচনে'র শেষ অভিনয়ে ব্যবহারের জন্য সে-বৎসরের অগ্রহায়ণে এই গানটি রচিত হয়। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ এই

---

৩৩. 'আবেগের ভাষাই সংগীতের মূল', "সংগীত-চিন্তা" পৃ. ১৩।

৩৪. কথার সুর সম্পর্কে 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা'/হর্বার্ট স্পেনসরের মত', "সংগীত-চিন্তা", পৃ. ৩০-৩৮ স্মরণীয়।

৩৫. 'ফোটে', 'ভুরু' 'চেয়ে', 'শ্রাবণ-রজনীতে', 'বাস'।

৩৬.

কবিতা		গান	
ক.	'গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে'	ক.	'গোষ্ঠে যবে নামে সন্ধ্যা'
খ.	'সলজ্জিত বাসর শয্যাতে'	খ.	'লজ্জিত বাসর শয্যাতে'
গ.	'উদ্দাম সংগীতে'	গ.	'উদ্দাম গীতে'

গানের প্রথম স্তবকটি রেকর্ডে গেয়েছেন। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র ১৩৬৮ সালের কার্তিক-পৌষ সংখ্যায় সেই গ্রামোফোন রেকর্ড অবলম্বনে তৈরি করা একটি স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে।

'উর্বশী' কবিতার সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ পরিচয়ের সংস্কার রয়েছে। বহুপঠিত এই কবিতাটির কাব্যমূল্য সম্পর্কে বিস্তৃত পর্যালোচনার পর সুরে এই কবিতাংশের আবৃত্তি প্রথমটা সেইজন্য কি রকম আকস্মিক আঘাত হানে। গান সহ্য হতে চায় না। 'তুমি কি কেবল ছবি' কবিতার গানও প্রথমটায় এমনি অনেক কাব্যরসিককে ক্ষুব্ধ করেছিল ব'লে শোনা যায়। কিন্তু কবিতা থেকে গানের পাঠে তত্ত্বভারমুক্তির ব্যাপারটি তুলে ধরলে কাব্যরসিকরা মেনে নেন যে, কবিতা থেকে আলাদা হয়ে এটি বাস্তবিক স্বতন্ত্র শিল্প। কিন্তু 'উর্বশী' সম্পর্কে দেখি আঘাতের বোধ গুরুতর।

সুরের দিক থেকে সহিষ্ণুভাবে বিচার করতে গেলে খেয়াল হয়, গানটির সঙ্গে "চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্যের 'আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী'র মিল আছে, বিশেষতঃ আরম্ভে, খুবই। অতিরিক্তের মধ্যে 'উর্বশী'তে কোমল ধৈবতের ব্যবহার হয়েছে। 'উর্বশী'র মতো ওতে-ও কথা প্রচুর, যুক্তাক্ষরও কম নয়,—'চিত্রাঙ্গদা', 'রাজেন্দ্রনন্দিনী', 'সামান্যা' 'ঊর্ধ্বে', 'পার্শ্বে', 'সঙ্কটে সম্পদে' 'সম্মতি'। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য গানের ক্ষেত্রে প্রচুর কথা বা যুক্তাক্ষর দেখে পিছপা নন কখনোই। "চিত্রাঙ্গদা"তে-ই এই গানটির কিছু আগে এবং কিছু পরে যথাক্রমে 'এসো এসো পুরুষোত্তম' এবং 'তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি'-তে প্রচুর যুক্তাক্ষরের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে।

আসলে সামঞ্জস্যবিধানের ক্ষমতা নিয়ে কথা। সারাজীবনের সাধনার পর সমন্বয়ের শিল্প তখন রবীন্দ্রনাথের হাতের মুঠোয়। তাই 'কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে' অংশে 'কম্প্র' এবং 'নম্র' উচ্চারণের প্রথমাংশে সুরকে তিনমাত্রা স্থির রেখে তারপর শেষে ছোট ছোট ঝাঁকিতে সাংগীতিক 'মুড়কি' ব্যবহার ক'রে ছন্দভঙ্গিমা সৃষ্টির কাজে 'ম্র' এবং 'প্র' যুক্তধ্বনিকে নিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন। সুরে 'গোষ্ঠে যবে নামে সন্ধ্যা' এবং 'ঊষার উদয় সম' ব'লে যে-বিরাম তার তাৎপর্য লক্ষ্য করলে সুরশিল্পীর দক্ষতার কাছে মাথা নত করতে হয়। 'সন্ধ্যা' ব'লে সুর নম্র হয়ে থেকেছে। কিন্তু 'ঊষার উদয় সম' বলতে শেষে সন্নিহিত সুরে মীড় সহযোগে উপনীত হয়ে স্বরকে ছড়িয়ে দিলে একটি উদ্ভাসিত আবির্ভাব অনুভব করা যায়।

তাই মনে হয়, নাটকের বিশেষভাবে গড়ে-তোলা পরিবেশে যে-গান সুসমঞ্জস—তাকে সেখান থেকে তুলে আলাদা ক'রে পরিবেশন করায় হয়তো তা বিসদৃশ ঠেকছে। সব গান অবশ্য বিসদৃশ ঠেকবে না—তবু কিছু গান সম্পর্কে এমন বলা যাবে, তার দৃষ্টান্ত 'আমি চিত্রাঙ্গদা'। এককভাবে এ-গান গেয়ে রসিকচিত্ত দ্রবীভূত করা কঠিন। অথচ 'তুমি কি কেবলই ছবি' রসগ্রহণে সেই বাধা সৃষ্টি করে না।

'নহ মাতা, নহ কন্যা' ঠিকমতো সকলের প্রাণের তারে আঘাত করতে পারছে না হয়তো, আলোচিত দুটি কারণে, এক. কবিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের দরুন রসিকচিত্তের পূর্বসংস্কার, দুই. নাট্যসূত্রপরম্পরা থেকে ছিন্ন হওয়াতে গানের প্রসঙ্গ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কালে এ-গান কতদূর গ্রহণীয় হয়ে উঠবে, তা বুঝবার জন্য আরো অপেক্ষা করতে হবে।

এইরকম বিতর্কিত সিদ্ধি 'ভারততীর্থ'[৩৭] কবিতার সংগীত রূপান্তর 'হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে' গানটির। কবিতার বাণী হৃদয়গ্রাহী ব'লে এ-কবিতার যা তার

৩৭. "সঞ্চয়িতা"তে এই নামে সঙ্কলিত "গীতাঞ্জলি"র কবিতা।

অংশের আবৃত্তি যত শোনা যায়, গানের প্রচলন তেমন নেই। এ-থেকে এ-গানের রঞ্জকতা গুণের অল্পতা অনুমান করা ভুল হবে কি? রবীন্দ্রনাথের অনেক গান সর্বসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য নয়—সে-কথা স্মরণ রাখলেও এই দেশাত্মবোধক গানটির শিল্প-সার্থকতা সম্পর্কে খটকা থাকে। এর কারণ এমন হতে পারে যে, গানটি যথাযোগ্যভাবে গাইতে শোনা যায় না। বস্তুতঃ, রচয়িতা যতো ভালো ক'রেই রচনা করুন, সংগীতশিল্প যথাযথ গায়নে প্রকাশিত হবার অপেক্ষা রাখে। যোগ্য শিল্পীকণ্ঠে গীত হলে আলোচ্য গানের আবেদন হয়তো কবির অভিপ্রায় মতো প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের যে-সব গানের কবিতাপাঠান্তর আছে, তার নিদর্শন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায়, তার মধ্যে যেগুলি বাণীর বহরে ছোটো তাতে সুরের বিচরণের সুযোগ অধিক। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে ছোটো মাপের গান বড় গানের পাশা-পাশি সুরে জায়গা নিয়েছে বেশী। বিরাম দিয়ে অথবা সুরে বিস্তৃত ক'রে ভাবকে বাণীর পরিধি থেকে দূরে ছাড়া দেওয়া হয়েছে। আর, বড়ো কবিতা সুরে ছোটো ছোটো ক'রে পা ফেলে কাব্যবাণীকে সুষমামণ্ডিত করেছে কেবল, সুর আপনাকে লীলায়িত করেনি সে-সব গানে। সৃষ্টির সাধনায় দুটো ধারা স্পষ্ট হচ্ছে, এক. কবিতাকে শ্রীমণ্ডিত ক'রে রসিকচিত্তে পৌঁছে দেওয়া, দুই. বাণীর অংশ কম রেখে ভাবকে সুরে সুরে পল্লবিত করা। প্রথম ধারায় ভাবসম্পদ বিকাশে বাণীর প্রাধান্য, দ্বিতীয় ধারায় সুরের প্রাধান্য।

সংগীতে, সুরের আকাঙ্ক্ষা অধিক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এইজন্য রবীন্দ্রনাথের বাণীপ্রধান গানে সুরের মৃদুতা নিয়ে অনেক রসিকমনে আপত্তি আছে। 'আরো কিছুখন না হয় বসিয়ো পাশে' এবং 'আরো একটু বসো তুমি'; 'আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়' এবং 'আমার নয়ন তোমার নয়ন তলে' এই যুগল রচনার মধ্যে কোন্‌টি বেশী ভালো লাগে—এ প্রশ্নের উত্তরে সকল পরিশীলিত চিত্তের মানুষ একই দিকে মত দিতে পারেন না। যাঁরা কবিতা ভালো বাসেন তাঁরাও সকলে 'সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠে'[৩৮] তৃপ্ত নন; অনেকেই সুরপ্রধান গানে তাঁদের আনন্দ হয় ব'লে জানান। অপরপক্ষে, মৃদু সুরে গভীর বাণী ব'লে-যাওয়ার শিল্পে আনন্দিত জনেরও অসদ্ভাব নেই।

এ-পর্যন্ত আলোচনায় কবিতার সংগীতপাঠান্তর প্রসঙ্গে কখনো দেখেছি, এক. সংগীতের উপযোগী করবার জন্য কবিতার সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে[৩৯]; দুই. সুরের বিহারের জন্য কবিতার অঙ্গচ্ছেদে গানের পদের ছন্দকে অকাতরে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে[৪০]; তিন. কথা কমিয়ে গানের পদের ভাব দীপ্ত করা গেছে—সে-সূত্রে ভাবে পরিবর্তনও এসেছে[৪১]; চার—গানে রূপান্তরের সময় কবিতার তত্ত্বঅংশ বর্জন ক'রে ভাবের রসটুকু ধ'রে রাখা হয়েছে[৪২]; পাঁচ. আবার সম্পূর্ণ কবিতাকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না ক'রে সুরে গাঁথা হয়েছে[৪৩]।

---

৩৮. "সংগীত-চিন্তা" পৃ. ৪

৩৯. "প্রত্যাশা" : 'প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায়'। 'উর্বশী' : 'নহ মাতা, নহ কন্যা'

৪০. 'আনমনা' : 'আনমনা, আনমনা'

৪১. প্রবাসী' : 'পরবাসী চলে এসো ঘরে', 'এসো এসো প্রাণের উৎসবে'

৪২. 'তুমি কি কেবল ছবি' : 'তুমি কি কেবলই ছবি'।

৪৩. 'গুপ্তধন' : 'আরো কিছুখন না হয় বসিয়ো পাশে'। 'সন্ধান' : 'আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়'। 'কৃষ্ণকলি' : 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি'।

সংগীত থেকে কবিতা পাঠান্তরের বেলায় ছন্দের ফাঁক পূরণ বা অভিব্যক্তির একান্ত সরলতা ভাবে তারল্য আনছে মনে হ'লে তাকে গাঢ় করবার জন্য ভাষার গাম্ভীর্য এবং পদের দৈর্ঘ্যে গতিতে মন্থরতা আনা হয়েছে দেখি। কিন্তু, এরকম কবিতা পাঠান্তরে ভাবের সমৃদ্ধি ঘটানো হয়ে থাকে ব'লে প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সবসময় ঐকমত্য হয় না। "সানাই" কাব্যে সঙ্কলিত গান থেকে পাঠান্তরিত কবিতার অনেকগুলি ভালো ক'রে লক্ষ্য করলে এ-কথার তাৎপর্য বোঝা যাবে। একটি মাত্র রূপান্তর আলোচনা করলেই এ-বিষয় স্পষ্ট হবে।

'এসেছিলে তবু আস নাই জানায়ে গেলে' গানটিকে আবৃত্তির বাঁধা ছন্দে সাজিয়ে 'দ্বিধা' কবিতার জন্ম। গানের বাণীর ভাবটি এই—এসে, না-আসার ছল ক'রে কুণ্ঠিত প্রিয়জনের চ'লে যাওয়াতে ঘাসে ঘাসে বেদনা বিস্তৃত হ'য়ে গেল, আর পাতায় পাতায় বিন্দু বিন্দু জল ঝ'রে শ্যামল বনান্তের অশ্রু ছলোছল ছবি তৈরি হল। সবশেষে, তার চ'লে যাওয়ার পিছনে রৌদ্রছায়ার আলিম্পন আশ্চর্য ঔদাস্যের সুরে পূর্ণ ক'রে তুলল ব্যথিত হৃদয়।

কবিতাতে গানের অতিরিক্ত কয়েকটি কথা নিতান্ত সাধারণ কিছু অনুভূতি নির্দেশ ক'রে নান্দনিক অনুভূতিকে বিপ্লুত করেছে। কথা কটি—'উপহাস', 'দীনতা', 'ছল-করা অবহেলা', 'উপেক্ষা'। যে কুণ্ঠা বা দ্বিধা হৃদয়াবেগের বিচিত্র প্রকাশের একটি ইঙ্গিতমাত্র দিয়েছিল, গানে যেখানে বলা হয়েছিল—তোমার সে উদাসীনতা সত্য কিনা জানি না সে,/চঞ্চল চরণ গেল ঘাসে ঘাসে বেদনা মেলে'—সেখানে কবিতায় বলা হোল 'তোমার সে উদাসীনতা/উপহাসভরে জানালো কি মোর দীনতা।/ সে কি ছল-করা অবহেলা, জানিনা সে—/ চপল চরণ সত্য কি ঘাসে ঘাসে /গেল উপেক্ষা মেলে'।

ছন্দের কথা বলতে গেলেও, আঙুলে মাত্রা গুণে যে তালে তালে মিলানো ছন্দ পাচ্ছি কবিতায়, তাকেই কি শুধু ছন্দ বলতে হবে? ভাবের ছন্দে, ধ্বনির সুষমায়, শব্দচয়নের সুসঙ্গতিতে, যে-ছন্দ জেগেছে গানের পদটিতে—তা যথেষ্ট নয়? ঘাটতি কোথায়, অতৃপ্তি কিসে? অন্ত্যানুপ্রাস ব্যবহারেও ছন্দ এসেছে এ-পদে। ছন্দের প্রচলিত ধারণায় আবদ্ধ থাকা এমনক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যিক মনে করবার কারণ দেখি না।

অধুনা চলিত "গীতবিতানে" যে-রকম বিন্যাসে গানটিকে পাচ্ছি, তাতে বিরামের জায়গায় ফাঁক রেখে ভাবের গতি নির্দেশ করা রয়েছে। অন্ত্যমিলের নির্দেশ মানলে একটু ভিন্ন বিন্যাস, বোধ করি, সঙ্গত হোত। 'তোমার সে উদাসীনতা' এক পংক্তিতে, দ্বিতীয় পংক্তিতে 'সত্য কিনা জানিনা সে', তারপরের পংক্তিতে 'চঞ্চল চরণ গেল ঘাসে ঘাসে' শেষে 'বেদনা মেলে' বিন্যস্ত হ'তে পারত। কিম্বা, আলোচ্য "গীতবিতানে"র, 'বাণী মোর নাহি', 'যদি হায়, জীবন পূরণ নাই হল মম', 'আমি যে গান গাই', 'ওগো স্বপ্ন-স্বরূপিণী', 'দিনান্ত বেলায় শেষের ফসল নিলেম তরী-'পরে' ইত্যাদি গান যে-ধরনে বিন্যাস করা হয়েছে, তেমন মুক্তক রীতির বিন্যাস এ-গানের জন্য উপযুক্ত হোত মনে হয়।

বাঁধা ছন্দের জন্য 'সমুখের পথ দিয়ে পলাতকা ছায়া ফেলে' যখন হয়ে যায় 'সমুখের পথে পলাতকা পদ-পতন ফেলে'—তখনই কি বাস্তবিক ছন্দোপতন নয়?

'তখন পাতায় পাতায় বিন্দু বিন্দু ঝরে জল' চরণের ছন্দ সেরে নিয়ে লেখা হয়েছে 'পাতায় পাতায় ফোঁটা ফোঁটা ঝরে জল'। 'বিন্দু বিন্দু'তে শব্দমধ্যবর্তী দন্ত্য-ন ধ্বনি যে-মমতা প্রকাশ করেছে—'ফোঁটা ফোঁটা' তার পাশাপাশি, কেবল বিবরণের ভাষা

হয়ে থাকলো। বদ্ধধ্বনিতে বাধা প'ড়ে, বিন্দুর গড়ে উঠবার জন্যে যেন বিরাম পাওয়া গেছে গানের বাণীতে। সেখানে 'ফোঁটা ফোঁটা' জল অশ্রুবিন্দু ফুটিয়ে তুলতে পারলো কি?

অথচ, 'মহুয়া'' কাব্যে যখন 'আরো একটু বসো তুমি' বা 'আমার নয়ন তোমার নয়ন তলে' গান দুটি কবিতা হয়েছিল তখন এমন আপত্তি তুলবার কথাই উঠতে পারেনি। বাইরের তাগিদে লেখা শুরু হলেও সত্যিই 'সচলতা শুরু হবা-মাত্রই লেখবার আনন্দই সারথি' হয়ে বসেছিল যেন সেখানে। সে যুগের গানে পাঠের ছন্দ ও কাঁটায় কাঁটায় বজায় রাখা হয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে 'আরো একটু বসো তুমি' পদ নিয়ে পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটি করবার কথা মনে পড়ছে। গানের পদকে কাব্যছন্দে বাগ মানাতেই কি অত পরিশ্রম? সেই স্বরবৃত্ত থেকে মাত্রাবৃত্তে চলা, বাঁধা ছন্দে আপত্তি জাগায়নি তো বটেই, ভাষার ওজন বৃদ্ধি হ'য়ে চলনে মন্থরতা আগায় কবিতার রসাস্বাদে তৃপ্তি দিয়েছিল। গানে যে-চাহিদা মিটেছিল সুর-ছন্দে—কবিতায় রূপান্তরে তা মিটিয়েছিল ভাষা আর ছন্দ।

তারপরে এই কবিতাগুলি যখন আবার গান হল—তখন ভাবের স্বতঃস্ফূর্তির বিপরীত পক্ষে শিল্পলীলা লজ্জিত হয়েছিল, না নন্দিত হয়েছিল, সেই প্রশ্ন উঠবে। এ-প্রবন্ধে পূর্বেই আলোচ্য গানগুলির বিশ্লেষণ হয়েছে। কবিতার সঙ্গে, সেই কবিতার সুরারোপিত রূপের তুলনায়, কোনো রূপেই রসব্যঞ্জনা অসার্থক ঠেকেনি। তাই দেখা যায়, স্বতঃস্ফূর্ত শিল্প সচেতন শিল্পকে লজ্জিত করে এমন কথা প্রমাণসিদ্ধ নয়।